KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৮/১ তাঁবার লেন, কল-৯ ৫৬/১এ প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ রোড, কল-৪২
Collection : KLMLGK	Publisher : অভিজিৎ ঘোষ
Title : অন্বর্থ (ANWARTHA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 2 3 4	Year of Publication : Feb - 1985 March - 1986 Jan - 1987
	Condition : Brittle / Good
Editor : অম্বু সাঁতরা (2) অম্বু সাঁতরা, শিলাদিত্য বিশ্বাস (3)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অ ক্ষ র

এদিনের অনিয়মিত পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ নিখিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র • কলিকাতা-৭০০ ০০৯ •

অন্বর্থ

প্রস্তুতি সংখ্যা দুই ॥ ফেব্রুয়ারি উনিশশো পঁচাশি

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পাঠক ভাবুন ঃ [দুই—ছয়]

কবিতা ঃ আর কেন ? ঃ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় □ ত্রিবন্দী ঃ অমল চক্রবর্তী □
বৃষ্টি নেই ঃ শ্যামল সেন □ পথে জমেছে ঘাস ঃ অসীম দাস □
[সাত—দশ]

গল্প ঃ অস্ত্রোপচার ঃ সতীন্দ্র ভৌমিক □ ঝি-চাকর ঃ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল □
[এগার—ত্রিশ]

প্রবন্ধ ঃ গ্রাম নিয়ে ভাবতে বসে ঃ অমিত সরকার □
[একত্রিশ—উনপঞ্চাশ]

চিঠিপত্র ঃ সৌমিত্র ঘোষ □
[পঞ্চাশ—চুয়ান্ন]

সম্পাদক ঃ অতনু সরকার
প্রচ্ছদ/অলংকরণ ঃ শমীন্দ্র ভৌমিক

দাম ঃ দু'টাকা

পাঠক ভাবুন

বিবিধ বুর্জোয়া দ্বন্দ্বগুলিকে গণতান্ত্রিক ঘোমটা পরাতে বছর কয়েক ভূখণ্ডে ছড়ি ঘোরানোর তালুক দিয়ে সংসদীয় ভালুক-নাচে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই নির্বাচনী ফেরী। আবার মানুষ শুনেছে বর্ণাঢ্য প্রতিশ্রুতি, জাতীয় উৎসবে যোগও দিয়েছে আগেরবারের চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ, দেখেছে আতসবাজীর মহড়া।

সাম্রাজ্যবাদীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দেশীয় শাসকদের বৈরী অবৈরী, একই সাথে ব্যবসায়িক ছোটো বড়ো গোষ্ঠীকলহে মানুষকে জুড়ে দেওয়ার, মানুষের সঙ্গত ক্ষোভে, প্রতিবাদে চন্দনচর্চিত সহজতম প্রকৃষ্টতম পদ্ধতি আর কি-ই বা থাকতে পারে। সাধু-সন্ন্যাসী, অর্ধনগ্ন ফকির আর ভোজবাজীর দেশ আমাদের। কৃষি ও শিল্পের অসমবিকাশ, বিকাশরুদ্ধতা, দূর অস্তু শিক্ষা—এই অনুপানের স্বাস্থ্যচিন্তায় দেশসেবী মহান কর্মব্রতী রাজ-সন্ন্যাসীরা অতিথিবৎসল, নিরীহ, দুঃখী, ধৈর্যশীল, সাদাসিধে ও নিরক্ষর ভারতবাসীদের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক টুপিতে চিরকালই ম্যাজিক দেখিয়ে আসছেন, আজও তাই চান।

ভাষাগত, জাতিগত প্রদেশ সৃষ্টি এদেরই অপকৌশল। বস্তুত জাতীয় কোনো ব্যাপার আমাদের ছিলো না। সংবেদনশীল জায়গাগুলোকে তাই এভাবেই ভাগ করে দিয়ে জন্ম দেওয়া হয় দুই পাকিস্তানের। সাধারণ মানুষ যাতে ক্ষেপে থাকে ব্যতিব্যস্ত থাকে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটিতে, এক জায়গায় না আসতে পারে তারজন্যই এইসব ব্যবস্থা। একইভাবে অধুনা পাঞ্জাবে জন্ম নেয় আকালী, খালিস্তানের দাবি।

তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দিরা-গোষ্ঠীকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার বুমেরাং—ভিন্দ্রেলওয়ালাদের। ভৌগোলিক গুরুত্বের যে অঞ্চলের পাশে রুশ-মার্কিন পুতুল প্রতিনিধিরা বসে আছে, ব্রিটিশের ছিল আধিপত্য যেখানে, এমন কাঁচামাল, সস্তার শ্রমিক, খনিজ,

জলজ সুযোগসুবিধা তারা কি সহজে হাতছাড়া করতে চায়? এ ভাবেই হাত হ'তে যখন চ'লে যায় দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর তুরুপের তাসটি তখন বিস্মৃত হয় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্রত। ক্ষমতাশীল দালাল বুর্জোয়ার মহাজনী চাপে আর এক সম্ভাব্য মহাজনের হাত হ'তে মুক্ত হ'তে ধর্মের পবিত্রতা ও গোষ্ঠীর সতীত্ব রক্ষার্থেই অমোঘ অস্ত্র—'অপারেশান ব্লুস্টার'। ওদিকে মানবতার পূজারী, মার্কসীয় নামাবলী যারা পরেন সেই রাজনৈতিক সমাধান অভিলাষীরা আবোল তাবোল বকতে শুরু করেন। বোদ্ধা মানুষদের কণ্ঠরোধ করতে সেন্সার। হাতিমৈত্রীর আওয়াজের আলখাল্লায় বাকী ভারতবাসীকে ক্ষেপাতে হয় শিখদের বিরুদ্ধে, সরকারী প্রচার মাধ্যম হ'তে যোগান দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় উপকরণ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসামে স্থিতু হয় প্যারামিলিটারী সরকার, কোথাও-বা রাষ্ট্রপতির মন্দাক্রান্তা শাস্ত্রীয়গীত, নিরীহ মানুষের ওপরও পুলিশী নির্যাতন। এদিকে অবশ্য 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক টুপি'তে ঢাকা দেওয়া যাচ্ছে না। তাই স্থগিত আছে এখানকার পালাগান। হচ্ছে না মধ্যপ্রদেশের ভূপালেও। রাসায়নিক যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও তার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি বেছে নিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে। তাই মিনি হিরোশিমাতে দুর্গত মানুষদের প্রতি অনুকম্পায়, মৃত হাজার হাজারদের উদ্দেশ্যে শোকে দোদুল্যমান মনে বন্ধ করা হোলো নির্বাচন। এখন আবার আজীব বাত শোনা যাচ্ছে সরকারী সাহায্য মিলবে দুর্গতদের, অনেক টাকা। তবে টাকায় নয় নির্বাচন চালাতে যে অর্থ তোলা হয়েছে সেই অর্থ ফিরিয়ে দিতে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন কোম্পানীর কাছে ভোজ্যতেল, খাদ্যবস্তু কিনে পাঠানো হবে দুর্গতদের। কোম্পানীও অনুদান দেবে অনেক টাকা মাথা পিছু, তবে তাও তাদের দেশের আইনজীবিরা যাতে বেশী রোজগার করতে পারে সেই টাকা থেকে তার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। নির্বাচনী হুল্লোড়ে কেউ কেউ দক্ষিণ বামপন্থী-রা দুঃখিত হতেও ভুলে গিয়েছিলেন প্রথমে। এখন হতে পারেন।

সাম্রাজ্যবাদীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই নাকি 'বিন্দুরক্তে দেশের রক্ষা' করতে বলে গেলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী, একথা কেউ কেউ স্বীকারও করছেন। তা নিয়ে জনজীবনে কতই না দুর্ভোগ, দুর্যোগ ও যন্ত্রণা। একটা কথা মনে হয় এ ব্যাপারে—হাকিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কথা। আজ তারা কেমন আছে? যারা ভাঙা মাটির থালায় রাঙা রাঙা পান্তা খেতো। খড়ের চালাটির

বা গঞ্জের হাট হ'তে কিনে আনা ডাঁশ-তাড়ানো বলদটিরই বা অবস্থা কেমন? আমাদের অবস্থা কি কিছু বদলালো যা কম্পুটারে ধরা পড়বেই। বৈয়াকরনিকদেরই সৃষ্ট ব্যাকরণ প্রমাদ এনে দিয়েছে এই প্রক্রিয়াটি। প্রক্রিয়াটিকে সমর্থনের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। তবে ঘটনাতো আর বিচ্ছিন্ন নয়। তাই এ অবশ্যম্ভাবী। শিল্পী বুদ্ধিজীবিরা অবশ্য এ নিয়ে ছবি আঁকছেন, শোকমিছিল, স্মরণসভা, পালাগান···কোন কিছুই বাদ পড়েনি। জাতীয় পতাকার সাথেই অর্ধনমিত হয়েছে কেন্দ্রীয় লাল দপ্তরের লাল পতাকা—কাপুরুষোচিত অমানবিকতার প্রতিবাদে। অন্যদিকে শোকের শিকার হয় যখন নিরপরাধ মানুষ, চালানো হয় গণহত্যা তখন মানবিকতাবাদীরা থাকেন নিস্পৃহ।

সাম্প্রদায়িকতার, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধাচারেও ঢক্কানিনাদ যাদের অলংকার তারা তো সেই ক্ষমতার বিন্যাসে বিশ্বাসী শোষক শ্রেণীরই অন্য রং—যারা শাসনের অধিকারে আগ্রহী এই সংসদীয় পথ মেনে নিয়েই। জাতীয় সংহতি ব'লে আমাদের কিছু ছিল না-কি! সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ নিয়ন্ত্রিত দেশে মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীরই সংহতি থাকে না—তো সাধারণ মানুষের। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রকারান্তরে সচেতন ধর্মান্ধতাকে মদতদান ক'রে এই ব্যবস্থার তাঁবেদারীই এদের পেশা।

আইনশৃংখলার নাম দিয়ে ভারতবর্ষে অঘোষিত সামরিক শাসন ও মানুষের ওপর অত্যাচার চালাতে নানাবিধ কালাকানুন তৈরী হয়েই চলেছে, নিরাপত্তার নামে বঞ্চনার প্রতিবাদকে কাঁচকলা দেখাতে। সিকিম, কাশ্মীর অন্ধ্রপ্রদেশের 'অগণতান্ত্রিক' প্রভুত্ব বদল নিয়ে যারা হৈ চৈ করেছেন তাদের হাতেও গণতন্ত্র ধর্ষিত হয়েছে, হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে যত্রতত্র। ধরতাই কিছু বুলি আঁকড়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থকে চরিতার্থ করতে তাদের আন্দোলন-খেলায় জনগণকে সামিল করার চেষ্টা চলছে। সাধারণের গণতন্ত্রের নামে মুষ্টিমেয়র গণতন্ত্র রক্ষার্থেই তারা আগ্রহী। যেখানে গণতন্ত্রের অর্থ হ'ল গুটিকয়েক ব্যক্তির শাসন-শোষণ-অত্যাচারের অবাধ অধিকার সেই গণতন্ত্রের বিপন্নতাকে আরো বিপন্ন করা প্রয়োজন। এ কথা বোঝবার সময় এসেছে। যারা বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার কর্মসূচী নেন তারাই আবার দারিদ্র্যমোচন, বেকারীত্ব দূরীকরণের বটিকা হিসেবে পশ্চিম বঙ্গে বিদেশী পুঁজিকে স্বাগত জানান। দেশে যারা গণতন্ত্র বিপন্ন ব'লে

মিছিল জমায়েত করেন বিদেশে গিয়ে সেই গণতন্ত্রেরই নাম-সংকীর্তন ও গুণগান করেন। জনগণ তাদের চরিত্রের দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে আলাদা কোন মূল্যায়ন করবেন?

বুর্জোয়াদের সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তিকে হারিয়ে যে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিলো, রাষ্ট্রীয় শোক, সর্বস্তরের সর্বদলীয় লাল নীল সহায়তায় তারা তা কাটিয়ে উঠেছে দক্ষতার সঙ্গেই। জয় এসেছে ঐতিহাসিক। রেগনীয় ধাঁচে সংসদে ভীড় বাড়াতে শাসকশ্রেণীর অনুগত চিত্রতারকাদেরও দেখা যাচ্ছে। বিরোধীদের বহু দুর্জয় ঘাঁটিও উল্টেছে। একদিন যিনি বলতেন রাজনীতিকে ঘৃণা করেন, সমস্ত ভারতীয় রাজনীতিবিদদেরও ঘৃণা করেন সেই তিনিই হঠাৎ আজীব রূপে সিংহাসনে। রাজার ঈশ্বর দত্ত অধিকারে বিশ্বাস রাখতে ব্রিটিশরা শিখিয়েছিলো। মূলতঃ ব্রিটিশপ্রভুদের সেই 'ভাঙো আর শাসন করো' পেটেন্টই আবার চলবে। ভুলে গেলে চলবে না তাদেরই হস্তান্তরিত ক্ষমতায় ক্ষমতাসীন জাতীয় দল নিয়েছিল দেশসেবার পরোয়ানা। সেই ঔপনিবেশিকতার রূপই রাখতে চাইবে তারা, যাদের বিড়ালগুলি প্রাধান্য পাবে—মাছ মাংস তারাই খাবে। বিরুদ্ধতা আসবে অপরাপর সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ হ'তে। সেই পুরোনো মদ্য নতুন বোতলে। স্থায়ী বোতল কতদূর সম্ভব তা সন্দেহের।

যাই হোক নির্বাচন নিয়ে বলছিলাম। নির্বাচনে যে কিছুই প্রতিফলিত হয় না, তাতো নয়, চারশোর ধাক্কা সমস্ত কংবিরোধী-রংদের ল্যাজে গোবরে করে দিয়েছে, বিকল্প বাসনার সুযোগে সংহত হয়েছে ফ্যাসিবাদ, বিকশিত হয়েছে। 'অ' বাবু, 'চ' বাবু, এবং 'জ' বাবু—অনেকেরই চোখের কৌণিকে নেচেছিলো দিল্লীর মসনদ, কিন্তু '···হাওয়া' যে এমন করে সব উড়িয়ে দেবে, তা কি কেউ জানতো! এ তো '···হাওয়া' নয় যেন 'ঝড়'। এখানকার 'পদ্ম' 'বাবুরাও' ···হাওয়ার অজুহাতে হাওয়া তুলতে চাইছেন, ভুল বকছেন অবিরত, মিলিয়ে দিতে চাইছেন নিজেদের ব্যর্থতা আর-সতোরাটির সাথে।

এখানকার অবস্থাটা একটু ভিন্নতর, আঞ্চলিক অভিভাবকের প্রতি ঋণাত্মক মনোভাবই সৃষ্টি করেছে নিম্নচাপ, ফলে বয়ে এসেছে হাওয়া। তাদের অপদার্থতা, সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা, গণ-আন্দোলন বিমুখ সংশোধনবাদী কৌশই অনিবার্য করে দিয়েছে তাদের পরাজয়। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন নানা সমস্যায় জর্জরিত, পুরোনো সেই কালো দিন ফিকে হয়ে এসেছে তার

স্মৃতিতে, কিন্তু রোজকার অভাব দুর্ভোগের যাতনায় ক্রমশই চিনেছে এই 'গরীব মানুষের সরকার' কে, আর ঠিক সেই কারণেই নির্বাচনের এই ফলাফল। তবে 'ই' ভক্তেরা অবশ্যই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবেন, আগের মতো আবার নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনবেন না পেঁচার রাজত্ব, মুশকিলটা হোলো ওনারা ওসব শিক্ষাটিক্ষার ধার ধারেন না, তাই অন্ধকার এদেশের মাটিতে নামবার জন্য উসখুস করেছে এটাই তো স্বাভাবিক।

সবচেয়ে যে প্রশ্নটা আজ জরুরী হয়ে পড়েছে, তা হোলো ধ্বংসপ্রায় সংসদীয় গণতন্ত্র নিয়ে। এধরনের নির্বাচন কি এখনও জরুরী—যা শুধু জনগণকে বিপথগামীই করে। বিশ্বজুড়ে আজকে আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীরা নিত্যনূতন ছলাকলায় সংসদীয় পথের কানাগলিতে বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে বিপথগামী করার অপচেষ্টা নিচ্ছে। একসময়ে এরাই জনযুদ্ধ বিপ্লবের কথা বলতো। কৌশলের নামে ডিগবাজী খেয়ে এরা আজও জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। কৌশলগতভাবে লেনিন বা মাও-ও অবশ্য পার্লামেণ্টকে ব্যবহার করেছিলেন—যার বলিষ্ঠ পরিপ্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট ছিলো। দেশীয় বৃহৎ সামন্ত, বুর্জোয়া, স্বাধীন বা প্রগতিশীল বুর্জোয়ারও অস্তিত্ব ছিল তখন। আজকের ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শত্রু বদলেছে, সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থনীতি। নির্বাচনকে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের স্বার্থে ব্যবহার করা যায় কিভাবে সেখানেও অনেক চিন্তা করতে হবে।

পরিশেষে জানাই মার্কসবাদ সম্পর্কে অন্বর্থের মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিশেষ ক্রোড়পত্র পেয়ে শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে ভাবছেন বর্তমান চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মার্কসবাদ নিয়ে বিরুদ্ধ মতামতটি। তারা নাকি এটাকে অচল বলেছেন; অবশ্য পরে বলেছেন বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে অচল। ঠিক এই ধরণের কথাই অনেকটা আমরা বলতে চেয়েছিলাম এবং এই প্রসঙ্গে মতামত আহ্বান করেছিলাম। আমরা বিশ্বাস করি মার্কসবাদকে এখনও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা বা সম্ভাব্যক্ষেত্রে তাকে সমৃদ্ধ করা ও যুগোপযোগী করার দরকার আছে। আমরা এর ওপর শ্রদ্ধাশীল এবং মার্ক্সীয় দর্শনে আস্থা রেখেই এগিয়ে চলতে আগ্রহী। কারণ সেই জায়গা স্বয়ং মার্কসই দিয়ে গেছেন।

যাবতীয় প্রতিক্রিয়ার ও সংশোধনবাদের মুখোশ খুলে দিতেই অন্বর্থের এই সংখ্যা প্রকাশ পাচ্ছে। আর তাই পাঠক, আপনি ভাবুন, বিক্রিয়া করুন।

কবিতা

আর কেন?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তারা তো সধর্মে স্থির, ঐ স্পষ্টভাষী
কোবিদ বৃদ্ধেরা। কীজন্য তাদের চুলে
কলপ? যৌবন গেছে, যাক্ না—তারা তো
আমাদের জন্য ঢের মহৎ চিন্তা ও কর্ম
করেছেন, আর কেন?

যুবকের ছদ্মবেশে পশুক্লেশ-নিবারণী-সভায়
অথর্ব-বেদ পাঠ—
তিনকাল গিয়েছে, তবু আমাদের মতো পাপী-তাপীদের জন্য
এত পরিশ্রম, এত স্বার্থত্যাগ—
আর কেন?

লেবু বেশি নিংড়ালে তেতো হয়, এইসব অশীতিপর
বৃদ্ধেরা কি জানেন না? কেবলই পরের দুঃখে
নেতা সাজা, মন্ত্রীর পোষাক পরা, পার্লামেণ্টে ঘুরঘুর—
পৃথিবীকে ঢেলে সাজানোর জন্য?

যে পৃথিবী তাঁরা থাকতে কোনোদিন বদলাবে না·····

১৮ই জুলাই, ১৯৮৪

ত্রিবন্দী

অমল চক্রবর্তী

১. দশমী

সে আসে নি আজ
আজ তার মেয়ের অসুখ।

সে আসে নি আজ
আজ সারারাত তার মেয়ের জানালার নিচে হাসপাতাল।

সে আসে নি আজ
আজ তার বিজয়া দশমী।

সে এসেছে আজ, কবি
অবিকল কবির মতন
পকেটে একটিই কবিতা তার
দশমীর প্রথম আলিঙ্গন।

ঢাকের শব্দে দেশ স্তব্ধ পাথর হ'য়ে গেল।

২. ছাই, কপালে পরাবো

অবিকল শ্মশান
আর, একমাত্র চুল্লি।

'কি পোড়ানো হচ্ছে ?'

'আত্মা'

এতদিনে ঠিকানা পেয়েছি।

বসে আছি, ছড়ানো বাকল ;
একমুঠো ছাই
দু'মুঠো ছাই
মুঠো মুঠো ছাই নিয়ে যাবো

কপালে পরাবো।

৩. ভাসান

এই তো এসেছি ক'রে স্নান।
সারা অঙ্গে রক্ত মাখা, দ্যাখো।
এই তো এসেছি ক'রে স্নান

নদীতে, নদীর অপমান
মেখেছি অঙ্গে, দ্যাখো দ্যাখো,
আজ শেষ অন্ধ অবসান

আজ শুধু ভাসান···ভাসান।

বৃষ্টি নেই

শ্যামল সেন

বোধ নেই নির্বোধ পাগল। নিরন্ন মুখে ব্যঞ্জনের লালা
দুর্ভিক্ষ তাড়ায় স্বপ্নে। বৈরাগী বাতাস, বোবা গাছপালা
পোড়ামাটি উচ্ছন্ন শিকড়ে রেখেছে মাথা ক্ষুধা-তৃষ্ণাহীন,
হৃদয়ে মানুষ নয় ; পাথর-শয্যায় শুয়ে গাঁথে অগ্নিমালা

নষ্ট-গন্ধ বাগানের ফুলে। পুঞ্জ মেঘ যায়-আসে ; রাত্রিদিন
শুধু গর্জে ; বর্ষে না। চৌদিকে নগ্ন বুদ্ধির রাজ্যপাট
ঘিরেছে বুকের তল নীরস জঞ্জালে। রক্তে-মাংসে শৌখীন
নিরুত্তাপ শব্দ-কারিগর ঘেরাটোপ জেনেছে স্বাধীন।

কতদূর উঠেছে আকাশ, জলাশয়ী মেঘ নেই ; বন্ধ কপাট
বহুদিন বৃষ্টি নেই ; মেঘমন্ত্রে কে জাগাবে বুকের তলাট।

পথে জমেছে ঘাস

অসীম দাস

রথের চাকায় ঘুণ ধরেছে পথ ঢেকেছে ঘাসে,
তুণেতে তোর তীর নেইকো কেবলি টংকার।
শুকনো আশার কথার ভাষা হতাশ হয়ে ভাসে,
নিজেকে তুই সাজাস রাজা কেউ ধারে না ধার।

এমন দিনে মগডালে সব কাদা-খোঁচার ভীড়,
ময়না টিয়ে গায়না রে গান পায় না হালে পানি।
তারা কেবল ডানা ঝাপটায় যাতনায় অস্থির,
ক্ষীর-ননীতে হাড়িচাঁচার চলছে রাহাজানী।

কানাকুয়োই আজকে নাকি শ্রেষ্ঠ নজরদার
কামলা-চোখে শ্রেষ্ঠ শোভা ফুলদানীটার ফুল।
বিষ-গেলা-নীল উদার আকাশ সেও মেনেছে হার,
ফুলদানীটার বাইরে সে যে—মিথ্যে সে বিলকুল।

রথের চাকায় ঘুণ ধরেছে পথে জমছে ঘাস,
চালশে চোখে দেখলিনা এই দারুণ সর্বনাশ।

গল্প

অস্ত্রোপচার

সতীন্দ্র ভৌমিক

বনের কাছে এসে লোকটা থামলো।

পড়ন্ত বিকেলে চায়ের দোকানে তখনো বেশ গুঞ্জন চলছিলো। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই ঝাঁপ বন্ধ করে যে-যার ডেরায় ফিরে যাবে। জানোয়ারের ভয় ছাড়াও শীতের ভয়ে সন্ধ্যার পর আর কেউ বেরোয় না। আরো দু-একটা দোকান চোখে পড়লো লোকটার।

এ অঞ্চলে ছোটোখাটো দেশি ঘোড়া দেখেই সকলে অভ্যস্ত কিন্তু এই লোকটার ঘোড়া বেশ বড়ো স্বাস্থ্যল এবং লাল। লোকটার পোশাক আশাকও কেমন যেন রূপকথার গল্পের রাজপুত্রের মতো।

চায়ের দোকান থেকে সবাই একবার চোখ ফেরালো লোকটা এবং ঘোড়াটার উপর। চা খেতে খেতে কে একজন বলে উঠলো, ঘরে ফেরার সময় এ কে আবার বনে ফিরে এলো।

ঘোড়াটা দাঁড়িয়েই আছে। হুইস্কি না খেয়ে চা-খাওয়া যাক ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। চায়ের দোকানের কাছাকাছি আসতেই লোকটা দেখতে পেলো সামনের বেঞ্চির লোকগুলো ওর জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে ভেতর দিকের এক পাশে সরে গেলো। লোকটা বসলো এবং চা খেতে শুরু করলো।

এমন সময় আর একটা লোক এলো। একটা কাঠের কুঁদোয় পা ঠেকিয়ে সে সাইকেলটাকে দাঁড় করালো। তারপর একবার বেল বাজালো।

দোকানদার একটা চৌকো কাঠে এক ভাঁড় চা চাপিয়ে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। চা-পান শেষ করে লোকটা দু-একটা কথা বলে সোঁ করে বেরিয়ে গেলো।

চা খেতে খেতে ঘোড়সওয়ারটা দেখলো, তক্তায় ফেলে যাওয়া পয়সাগুলো দোকানদার গরমজল দিয়ে ধুয়ে তুললো।

'পয়সা ধুলেন কেন?'

'উনিই বলেছেন ধুয়ে নিতে, উনি কুষ্ঠাশ্রমের ডাক্তার।'

ঘোড়সওয়ারটা এবার একটু নড়েচড়ে বসলো। বাকি চা-টা শেষ না করেই পকেট থেকে টাকা বার করলো। এবং ধাঁ-করে বেরিয়ে যাবার মুখেই দোকানদার বলে বসলো, 'এই নিন আপনার বাকি পয়সা।'

লোকটা আড়চোখে দেখে নিলো, সেই পয়সাগুলো এখনো তক্তার উপরই আছে। পয়সাগুলো ফেরৎ নিয়ে লোকটা এসে ঘোড়ায় চাপলো।

ঘোড়াটা বেরিয়ে যেতেই সবাই সেইদিকে তাকালো। 'ঘোড়াটা এত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালো কেন? ওদিকে তো রাস্তা বন্ধ। মজা নদী। চুলোয় যাক।' দোকানদার দোকান গোছাতে লাগলো।

আরো জোরে আরো জোরে এবং আরো জোরে ছুটে গেলে নিশ্চয় এ অঞ্চল ছেড়ে, লোকটা ভাবলো, একটা সুস্থ পরিবেশে গিয়ে পৌঁছোবে।

দেখতে দেখতে রাত এবং শীত ঘনিয়ে এলো। লোকটা টের পেলো সে বনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বিরাট বিরাট বনঝোপের মাথায় ফিকে চাঁদের আলো ঝিলমিল করছে। কুয়াশার ভেতর চাঁদের আলো কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছে লোকটার। নির্জন বনের পথ। ঝিঁঝিপোকার নিবিড় একটানা গুঞ্জন সমস্ত অঞ্চলের নিঃশব্দতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে লোকটা বুঝি স্বপ্ন দেখছে।

লোকটার হঠাৎ মনে হোলো পথ ভুল করে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার গতিও স্তিমিত হয়ে এলো। লোকটা ঘোড়া থেকে নামলো। শীত করছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো।

এমন সময় একটা অস্বাভাবিক জান্তব গর্জন শোনা গেলো। সেই গর্জনে ভীত হয়ে ঘোড়াটাও প্রাণপণে ডেকে উঠলো এবং দাপাতে থাকলো। লোকটার আঙুল গলে সিগারেটটা পড়ে যেতেই লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসলো। সওয়ার কাঁধে চাপতেই ঘোড়াটা একটু শান্ত হয়ে এলো কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার সেই শব্দ এবং ঘোড়ার দ্রুত ধাবমানতা একসঙ্গে ঘটে গেলো!

ঘোড়াটাকে বশ করতে না পেরে লোকটা হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ঘোড়াটা যখন খুশিমতো ছুটছিল তখন বড়ো বড়ো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছোপ ছোপ চাঁদের আলো লোকটার গায়ে পড়ছিলো। হঠাৎ হঠাৎ পাখি ডাকছিলো এবং দ্রুততর ঘোড়ার শব্দ থপ থপ করছিলো।

ভয়-পাওয়া-ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কোথাও এসে থামলো। লোকটার তেষ্টা পেয়েছে। লোকটা আবার নামলো। ঘোড়ার জিনে বাঁধা একটা থলে ছিলো। থলের ভেতর লোকটা হাত ঢুকিয়েই বিরক্তি ও ক্রোধে ফেটে পড়লো। বেয়াদপ ঘোড়ার দ্রুতধাবনের কোনু ফাঁকে বোতলটি পড়ে গেছে।

ঘোড়ায় আর চাপলো না লোকটা। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর হাঁটবার পর দেখলো এক বিশাল প্রাচীর ঘেরা আবেষ্টনী। লোকটা স্বস্তি পেলো। কাছাকাছি লোকালয় শুরু। রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে যাহোক করে।

আবেষ্টনীর কাছে এসে লোকটা একটা ফটক দেখতে পেলো। ফটকের কাছাকাছি গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারলো। কাউকে দেখা গেলো না। দু-তিন পা পিছিয়ে যেতেই লোকটা এক সাইনবোর্ড দেখতে পেয়েই শিউরে উঠলো।

দ্বিপদীবন্ধু হলে লোকটা হয়তো-বা আজ ঘোড়াটাকেই খুন করতো। ঠাস করে এক চড় কষালো ঘোড়ার গালে। নির্বাক ঘোড়া মানুষটার মাথা ছাপিয়ে নিজের গলাটাকে টান টান করে দিলো। আর কিছু না বলে মুখে এক অশ্রাব্য গালি তুলে লোকটা ঝটুকা মেরে ঘোড়ার উঠে বসলো।

আলো-আঁধার পথে নিরুদ্দেশ চলতে চলতে লোকটার মনে হোলো চারদিক থেকেই ওকে কুষ্ঠরোগীরা তাড়া করে ধরেছে। আতঙ্কে লোকটা হাঁপিয়ে উঠলো। ঘোড়াটা নিজের খেয়ালে লোকটাকে যেখানে নিয়ে এসে থামলো তারই শেষ বাঁকে বসতির মতো অঞ্চল থেকে কিছু আলো দেখা যাচ্ছে।

নীচতলার ঘরে দরজা জানলা কিছু নেই। হা-হা করছে। নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে লোকটাকে ওপরে তুলে আনলো যে বউটা সে এখানেই থাকে।

বউটার কাছেই জানতে পেলো এটা পাগলা সাহেবের ডেরা বলে খ্যাত। এখন সংক্ষেপে অনেকে পাগলা ডেরা বলে। সাহেব দেশে যাবার সময় এই কোঠীর দেখাশোনার ভার অর্জুনকে দিয়ে যায়। সাহেব আর

ফেরে নি।

অর্জুনের বউ বলল, 'তুই ওই খাটিয়ায় শুয়ে থাক, আমি মেঝেতে লেট যাবে।'

নীচতলায় বেঁধে-রাখা ঘোড়াটার খুরের শব্দ মাঝে মাঝে লোকটা শুনতে পাচ্ছে। লোকটা তক্তাপোষের ওপর কোনোরকমে গুঁটিসুঁটি মেরে বসে আছে—শীতের চোটে শুতে পারছে না।

চট ঢাকা জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বউটা ঘুমুচ্ছে চাঁদের আলোয় ভারী সুন্দর লাগছে ওকে। ঠাস চেহারা। মুখটা আজন্ম দেখা দুগ্‌গা প্রতিমার মতো। রঙ যদিও আবলুশ কালো তবে মুখশ্রী অপরূপ।

পায়ে একটা চাপ পড়তে ঘুম ভেঙে গেলো লোকটার। লোকটা অবাক হয়ে দেখলো ওর গায়ে চট এবং মেয়েটা চটের বাকি অংশ গায়ে জড়িয়ে পায়ের তলায় ঘুমুচ্ছে। কখন মেয়েটার পাশ ফিরে শুতে গিয়ে বুক দিয়ে পা দুটো চেপ্টে ধরেছে। ভোর হয়ে এসেছে। লোকটা পা দুটো সরিয়ে নিলো। মেয়েটা এখনো ঘুমিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর লোকটা উঠে বসলো। সিগারেট ধরালো। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দু-হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে ধরতে যেতেই…'বেশরম বজ্জাত!' বলেই মেয়েটা তীর বেগে উঠে বসলো।

মেয়েটা বেরিয়ে যেতেই লোকটা টের পেলো ওর চোখ জ্বালা করছে, শরীরের সব বল মিলিয়ে গেছে। নিজেকে একটা ভৌতিক বলে মনে হোলো লোকটার।

হঠাৎ ওর মনে হোলো সমাজের সর্বত্র কুষ্ঠরোগ ছড়িয়ে পড়েছে—ও নিজেও একজন কুষ্ঠরোগী। ম্যাজিক লণ্ঠনের মতো লোকটার চোখের সামনে ভেসে উঠলো—

শোষণ-ধর্ষণ-লুণ্ঠন-বক্তৃতা- মুখোশ-কুষ্ঠ- অর্জুনের বউ-অর্জুন-পাণ্ডব-কৌরব-কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র-কৌরব-পাণ্ডব-অর্জুন-অর্জুনের বউ-কুষ্ঠ-মুখোশ-বক্তৃতা-লুণ্ঠন ধর্ষণ-শোষণ।

এমন সময় লোকটা শুনতে পেল : আই বাপু, তুই পলাইছিস!

সম্বিত ফিরে পেয়ে লোকটা নেমে এলো নীচতলায়।

লোকটা দেখতে পেলো ঘোড়াটার পেটের ভেতর একটা অপূর্ব মজবুত-দেহী লোক গুটি মেরে শুয়ে আছে। হাত দুটোয় নিপুণ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

'তুই রোগ সারাইবি না?'—মেয়েটি আবার বলে উঠলো।

লোকটার মাথা ঘুরে গেলো। ও পালিয়ে যাবে কোথায়? যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই কুষ্ঠ। লোকটার মনে হোলো ওর নিজের ভেতরও এই পচনশীলতা শুরু হয়ে গেছে। নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত এর হাত থেকে কারোই নিস্তার নেই।

লোকটার হাতে লাগাম। হাসপাতালে যাচ্ছে ওরা। অর্জুন ঘোড়ার উপর বসে আছে। অর্জুনের বউ হাসি হাসি মুখে সকলের আগে আগে যাচ্ছে।

ভোরের পাখি ডেকে উঠেছে। ঘাসের উপর শিশির বিন্দুগুলো পাহাড় ডিঙিয়ে সূর্যের উঁকি মারার সাথে সাথে ঝক্‌মক্ করে উঠছে।

———

ঝি-চাকর

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

শিশির ভেজা ঘাস। কনকনে হিমের চাদর। উঠোনে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ফসলের আঁটি। হাড়-পাঁজরা বার-করা কুঁড়েগুলোর ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা মানুষজন। পোষ মাসের শূন্য মাঠের মত দুঃখ।

এই নিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে ছোড়াচি গ্রামটা।

অতিকায় কালো পাথরের চাঙড়ার মত স্থানু হয়ে রয়েছে রাত।

এখনো পাতলা হয়নি আন্ধার।

ঠিক এসময় উঠোনের ওপর ঝুলে থাকে চাঁদ। রাতের লোমশ কালো শরীরের ওপর কে যেন বসিয়ে দিয়েছে দুটো ব্যাটারী ফুরিয়ে যাওয়া চোখ।

ঠিক এসময়ই তাকে দেখুন। শুয়ে আছে সে।

তার হাত পা অসাড়। পায়ের তলায় জ্বলুনি। গাঁটগুলো দাপায়। ঘুমের ঘোরেও কামড়ানো ব্যথায় পা দুটো কেঁপে ওঠে। নাকের পর্দা ফুটো করে ফসফস হাওয়া বেরোয়। ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে থাকা ইঞ্জিনের মতোই ধুঁকতে ধুঁকতে শ্বাস ছাড়ে তার শরীরটা।

মাথাটা একদিকে হেলে কাত হয়ে গেছে। এলোমেলো ছন্দহীন খোঁপাটাকে মুচড়ে রেখেছে কালো কালো দড়ির অজস্র জটিল গ্রন্থি। হেলে যাওয়া মাথাটাকে কারো কারো বস্তার ঝুঁটি বলে ভুল হতে পারে। তার দুই ঠোঁটের মাঝখানে হাঁ। অন্ধকার জমে আছে তাতে। আলগোছে দুটো হাত ছুঁয়ে আছে পৃথিবীর শরীর।

এরকম একটি ঘুমের দৃশ্যের ওপর সশব্দে যবনিকাপতনের মত ইস্টিশনের সেই অলক্ষণে মালগাড়ীটা ঘ্যাঁগর ঘ্যাঁগর শব্দ করে থামে। সঙ্গে সঙ্গে আতুরী লক্ষ্মী মাসীর তীক্ষ্ণ বাঁশির মত গলার আওয়াজ এই শেষ রাতের গতর মরা আন্ধারের বুক ছিঁড়ে ফ্যালে।

তবে কি কাল ঘুমে খাইল ? অরে ওঠ্, টিশনে যাবিনি ?

তার এলিয়ে পড়া শরীরের কন্দরে কন্দরে খবর চলে যায়। শুরু হয় অতি ব্যস্ত সময়ের সাথে পাল্লা দেওয়ার প্রতিযোগিতা। তড়াক্ করে লাফ দিয়ে ওঠে সে। গায়ের আচমকা ঝাপটে অ্যালুমিনিয়ামের থালাখানা বিদ্‌ঘুটে শব্দ করে ছিটকে পড়ে। আন্দাজে কলসি থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে নিজের অনিচ্ছুক চোখ দুটোকে রগড়ায় সে। কিছুতেই খোলে না চোখ। কোনোমতে অন্ধের মত পাতলা চাদরটাকে গায়ে চাপিয়ে সে বেরিয়ে আসে উঠোনের হাড় কামড়ি শীতের রাজ্যে।

উঠোনে এসেই সে কেমন বোকা বনে যায়। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। ভারী কুয়াশার চাদরে ঢেকে গ্যাছে বিশ্ব চরাচর। টপ্‌টপ্ করে শিশির ঝরছে।

সে চাঁচায়—"অ মাসী—কিছুটি দেখা যাচ্ছে নি গ। কুয়াশায় চাদ্দিক খেচে।"

শব্দ করে হাই তোলে সে। হাতের তালুতে হাত ঘষে উত্তাপ নেওয়ার চেষ্টা করে। ওদিক থেকে আবার বেজে ওঠে লক্ষ্মী মাসীর বাঁশি—

"মুখপুড়ি, জোয়ান বয়েসে তর কি চোখে ছানি পড়তিছে ?"

প্লাস্টিকের চটিতে পা হড়কাতে হড়কাতে এবড়ো খেবড়ো নাবাল জমির আল ডিঙোতে থাকে তারা। বেয়াড়া উত্তুরে বাতাস তাদের সব উত্তাপ যেন শুষে নিতে চায়। কোথায় যেন মুরগীর কোঁকর কোঁ আওয়াজ। আচমকা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় দু'একটা নেড়িকুত্তার বিরক্ত ঘেউ ঘেউ তাদের তাড়া করে বেড়ায়। ক্যাঙারুর মত লাফাতে লাফাতে বিড়বিড় করে সে। হৃৎপিণ্ডের ওঠানামায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। অনেক কষ্টে তালুতে জিভ ঠেকিয়ে মুখের ভেতরে রসের সন্ধান করে বেড়ায় সে। তারপর ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় খাঁকারি দেয়—

"জোয়ান ! এমন জোয়ান আর ক'জনা আছে মাসী ? বাসন মাজতে মাজতে হাত দুটো বুড়ো হইছে। চোখ দুটোও আর থাকবেনি।"

ব্যস। এক মিনিটেই তার আক্ষেপ শেষ। ভাবাভাবির অবকাশ তার নেই। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরবার সময় সেই কেলাস সেভেনে পড়তে পড়তে ফুটফুট করে বুকের মধ্যে উথ্‌লে উঠতো দু-এক টুকরো ভালোলাগার বুদ্‌বুদ। সে তো কবে মিলিয়ে গ্যাছে। আজ পর্যন্ত ক'টা শীত বসন্ত এলো গেলো তার হিসেব কষবার সাহসটাও তার নেই। শরীরের কোথায় কি কি পরিবর্তন হয়েছে সেই নিতান্ত কিশোরীর কৌতূহলটুকু ভালো করে জানান দেওয়ার আগেই সে শেকড়শুদ্ধ উৎখাত হয়ে গেলো। এখন শুধু পাঁচটা পঞ্চাশ আর

ছ'টা বাহান্নয় সেকালের মাথা দুটো দেখার জন্য নত হয়েই কেটে যায় কাল। ম্যাড়মেড়ে অলস সকাল আর ক্লান্ত সন্ধ্যে।

গাঁক গাঁক করে ট্রেনটা দৌড়ে এলে সে এই কাকডাকা ভোরে তার খোলে পুরে দেয় নিজেকে। শিয়ালদা স্টেশনে মানুষগুলোকে যখন উগরে দেয় যন্ত্রদানবটা তখন সে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে কোলকাতার মানচিত্রের গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যেতে থাকে। প্লাস্টিকের চটির খটাখট্ শব্দ তুলে ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি ভাঙে। তারপর বোকা বোকা ভীরু চাউনিতে মুখ ঝামটা হজম করে বাবুগিন্নীর।

(২)

নাম তার বিছুনি। কবে যেন বিছানাকে বিছুনি বলেছিল। সেই থেকে বিছুনি।

রোজকার মত আজও সে স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। তাকে হাঁপাবার সময় না দিয়েই হুড়মুড় করে লোকাল ট্রেনের রাগী মাথাটা ভাঁটার মত চোখ জ্বেলে তেড়ে যায় স্টেশনের ভেতরের দিকে। তারপর একসময় থামে। এই কাকডাকা ভোরের মানুষগুলো তার চেনা। বিশাল এক ঝুড়িতে রাজ্যের শাকপাতা নিয়ে কোঁকাতে কোঁকাতে শুঁটকী বুড়ি এই পড়ো এই পড়ো করতে করতে টলটলিয়ে সেঁধিয়ে যায় ভেতরে। খুচরো শব্জী ব্যাপারী আর আড়তদারের বেপরোয়া দাপট চারদিকের সবাইকে তুচ্ছ করে জোর জবরদস্তি বড় বড় বস্তা গড়িয়ে দেয় কামরার মধ্যে। পায়ে হাতে দড়ি বা চাঁছের ঘষায় ছড়ে গেলেও টুঁ শব্দটি করবার জো নেই। এসব ডিঙিয়ে অভ্যেসমত ভিড়ের ভেতর দিয়ে সুড়ুৎ করে গলে যায় সে। তারপর নির্দিষ্ট কামরায় নির্দিষ্ট জায়গায় থিতু হয়ে খানিকটা বন্ধ দম ছাড়ে। আগেভাগেই জায়গা জুড়ে তৈরী হয়েছে তার মত মেয়েদের একটি দেওয়াল। মালতী বলে ইউনিয়ান। কোলকেতার বাবুগিন্নীদের হাতে হাতে কাজ এগিয়ে দেওয়ার জন্য এবং অফিসগামী বাবুদের অফিস যাওয়ার গিয়ার ফিট করে দেওয়ার জন্য শহরগামী মেয়েরা। বারো তেরো থেকে ছাব্বিশ-সাতাশ, তেত্তিরিশ। বিধবা সধবা। বে-হওয়া বরে-খেদানো। রুগী সোয়ামী। অন্ধ বাপ মা এই মোটামুটি মালতীদের গপ্পো।

একটা বয়েসী ভদ্দরলোক কনুই দিয়ে গুঁতো মারার জন্য আগে থেকে

ব্যাগ হাতে জনস্রোতের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ভেসে এলেই সে বুঝতে পারে আঘাতটা কোথায় গিয়ে লাগবে। দ্রুত শরীরটাকে মোচড় দিয়ে ঘুরে গিয়েই ফোড়নের মত পট পট করে ওঠে বিছুনি—

"মরণ"

"কী করবো ভীড় দেখতে পাচ্ছেন না?

মেয়েছেলে দাঁইড়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? কানা নাকি?

হ্যাঁ—একন আর মেয়েছেলে। মেয়েছেলে ব্যাটাছেলে সব-সমান।

সব—সোমান। মালতি মুখিয়ে ওঠে। বলি দুদিন বাদে যে ঘাটে ঠেকবা মুখ সামলে কথা বলবে।

সামলাতে পারবনি গ। খোলায় ধান দিয়ে দিইচি। এখন পটপট করে ফুটবে। সরে যাও—

অন্যরা খ্যাক খ্যাক করে হাসির হররায় ভরিয়ে তোলে কামরা আর বুড়ো গরগর করতে করতে পাকানো চোখে কৃত্রিম আগুন নিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। যাওয়ার সময় ধারালো নয়নের মতো মুখ করে—

"শালা ঝি-চাকরের জাত তো আর কত ভালো হবে"

সুধা বলে "যান ভদ্দরনোকের জাত, ছোঁয়া নেগে যাবে ঝি-চাকরের।"

ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে বলে—"লোকটা হাড়ে হাড়ে পাজী, বুঝলি। ঠিক আমার বাবুর মত।"

মুখটা বকু মিস্তিরির মত গম্ভীর করে, চশমার ফাঁক দিয়ে বলবে—"চা-টা দিয়ে যাও তো সুধা। আর ইদিকে চশমার নীচের চোখের ভেতর নাল ঝরছে। ভাবে আমি যেন বুঝিনা। স—ব বুঝি বাবা। ইসব ভদ্দরনোকদের খুরে খুরে দন্ডবৎ!"

হঠাৎ বিছুনি চোখের ইশারায় সুধার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একদিকে। সুধা চোখটা টেরাতে না টেরাতেই মেনি কনুয়ের গুঁতো মারে।

আসরে অবতীর্ণা হয়েছে ছায়া। হঠাৎ ছায়াকে দেখে মালতীদের জোড়া জোড়া চোখ ড্যাবড্যাবায়। ছায়ার গা শিরশির করে।

কেংটি ছায়ার এখন গতরে বাতাস নেগেছে গ।

চোখের দিরিষ্টিটা কেমুন কচি কচি দুব্বো ঘাসের মত লকলকিয়েছে গ।

ছায়া কাছে আসতেই বিছুনির চোখে চোখ পড়ে। তার ঠোঁট থেকে ছিটকে বেরোয় কথা—"এসতেছে এক আনি/তার গায়ে নোতন কানি।"

রাগে গুম হয়ে যায় ছায়া। খলবল করে ওঠে

আমারে আজ নোতন দেখতেছ নাকি?

বাব্বা! কি সেজেছিস রে। কাজল দিছিস চোকে। চুল বেঁধেছিস নোতন ফিতায়। নোতন শাড়ীতে চমকাচ্ছিস। শাড়ীটা কে কিনে দিল রে?

নিজের টাকায় কিনছি।

মালতী বলে—হেঁ, নিজের টাকায়। কত টাকা রোজগার কচ্ছিস্ রে? এ মাসের মাইনেটা কি শাড়ীতে দিলি?

মৌনি হঠাৎ শরীর ঝাঁকিয়ে বলে—এর ভেতর কতা আছে।

খেঁকিয়ে ওঠে ছায়া—কি আবার কতা!

মেনি বলে—আহা রাগ করিস ক্যান? বলনা তোর বাবু দিয়েচে—

বাবু দিতে যাবে কোন্ দুঃখে?

তোর দুঃখে—

যা ত কতা বলবিনি।

আহা যা-তা কোথা। এই ধর বাবুর বাজার করা—দুপয়সা ইদিক করা। ধর বাবুর কাপড় কাচা—দুপয়সা ইদিক করা। ধর তরকারী কোটা বাটনা বাটা জল আনা, চা করা আর—

সুধা বলে "গা টেপা।"

"অমন চোখ দিয়ে কতা বললে আম্মো বলতে পারি। মেনি সেদিন ওর বাবারে কে জামাটা কিনে দিছে ওটা কিসের টাকা? হাতটানের জন্য ক'বাড়ী কাজ গেছে জানি না ভেবেচিস—স-ব জানি।

মেনি বলে—জেনেছিস বেশ করেছিস। তোর মত তো আর ঢং করে খাইনা। বুড়া বাপের জন্য একটা জামা···ছায়া তখন সব পড়েছে।

ছায়ার রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে পড়া দেখে সবাই ঢেউ ভাঙার মত হেসে হেসে ভেঙে যায়। হঠাৎ বিছুনি ধমাস করে নিজের হাতের টিফিন কৌটো সমেত ব্যাগটা নীচে ফেলে দেয়। শব্দটায় সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকায়। বিছুনি তখন সাথীদের ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে যাওয়া মুখের ওপর ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো সরল হাসির বরফ কুচি।

আমার বাবুর সাথে বাবুগিন্নীর যেখন ঝগড়া লাগে তখোন সে এমনি ধারা জিনিষ ফেলে দিয়ে কাঁদতে বসে আর বাবুটা ঠায় বোকা বোকা চাউনি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। গিন্নী যখন একপন্থ কাঁদা শেষ করবে তকোন

বাবু দাঁত কড়মড়ি খেয়ে শুরু করবে—বিছুনি ভাবভঙ্গিতে মুখর হয়ে ওঠে—"এই প্লেটটা যে ভাঙলে এটা কি তোমার বাপের ঘর থেকে এনেছে? অত তোমার গরম কিসের শুনি? দুবেলা গিলছো কাজের লোককে শাসন করছো, অর্ডার মারছো আর পান থেকে চুণ খসলেই যখন তখন ফ্যাচফ্যাচ করে কেঁদে বাণ ডাকিয়ে নিচ্ছো। সারা দিনে তো কুটোটি নাড়তে হয় না। ফুলেফুলে ঢোল হচ্ছো তবু তোমার এত রোয়াব কেন শুনি?

"কি—বিস্মুদ্বারে তুমি আমার বাপ তুললে! ছোটলোক কোথাকার। বংশে তোমাদের ভদ্রতা নেই? মা বাপ তুলে ঝি-চাকরদের মত হামলে এসেছো আমার ওপর—

"ওঃ! এলেন আমার ভদ্দর লোকরে! তুমি যদি ভদ্র হতে তাহলে কাজের লোকের সামনে এমন ড্রামা করতে না! লজ্জা সরমের মাথাতো খেয়ে বসে আছো এবার আমার সম্মানের মাথাটা খেয়ে ধেই ধেই করে নাচো।"

"ঝি-চাকরের সামনে আমায় অপমান করছো, আমি আজই চলে যাবো।"

"যাও না যাও। আমার হাড়ে বাতাস লাগে তাহলে"—

হঠাৎ বিছুনি শরীরটা নুয়ে কি যেন তুলতে যায় মাটি থেকে, আবার সবার চোখ জোড়া আটকে যায় তার ওপর। মেনি গর্জন করে ওঠে—

"খবরদার ওগুলো তুলবে না। যে ভেঙেছে তাকেই তুলতে হবে। আমি অফিস যাচ্ছি"—

"অ্যা হ্যা হ্যা হ্যা!" আবার হাসির তুফান।

বিছুনি হাসতে হাসতে যোগ দেয় তাতে—হ্যাঁরে, একথা বলেই বাবু ব্যাগ হাতে আপিসে চললো, আর বোঝ—ঝাড়ু হাতে আমি আর সামনে তেলে বেগুন বৌদি"

আর এক পেট হাসির হররা। বাতাস কেঁপে ওঠে। কেউ কেউ বিরক্ত মুখে তাকায়। কেউ ভীষণ ক্ষেপে যায়। কেউবা ব্যাজার মুখে এই টুকু টুকু মেয়েদের পাকামি ফিচলেমি দেখে যায়। কেউ যোগ দেয় হাসিতে, কোন নিতান্ত গম্ভীর ভদ্দরলোকের ঠোঁটেও কিছুক্ষণ বাদে দেখায় হাসির রেখা।

দু'পাশে মানুষের দেওয়ালের ভেতর চেপ্টে থাকা সেই আগের বুড়ো এবার গলার সব জোর দিয়ে বেজে ওঠে—

"দেখেছেন মশাই! কেমন ঘরের কথা বাইরে চাউর করে দিয়ে মজা

লুটছে। অ্যাঁ। এদেরকে আর কাজে রাখা যায়। কি আস্পর্ধার কথা। যার নুন খাস তার হাঁড়ির খবর পাব্লিককে জানাচ্ছিস। কথায় বলে ঝি-চাকরের জাত, কতো আর ভালো হবে।"

ফোঁস করে ওঠে বিছুনি।

বেশি কোথা বোলনি। ঝোলার ভেতর বেড়ালটা বেইরে পড়বে।

রাগে কাটারী হয়ে যায় বুড়ো। চোখ দুটোয় আগুন ভরে নেয় সে। কিন্তু বিছুনি যেন লোহাকাটা করাত দিয়ে বুড়োর সম্মানের ভিত কাটতে শুরু করে দেয়।

'কথায় কথায় ঝি-চাকর! যেন চাকর হয়ে জন্মেছিনু। তরা যে আপিসে চাকরগিরি করিস, হুকুম তামিল করিস সেখেনে তোদের কেউ চাকর বলে, সুমুন্দুরে খড়কুটার মোতন চাকরীটারে ধরে আছিস, চাকরীটা চলে গেলে তোদের বৌ ঝিদের যে পরের বাড়ীর এঁটোকাঁটা ঘাটতে হবে। তখন এই বাবুয়ানা কোথায় থাকবে?

মালতির ফোড়ন কাটা মুখ ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

ঠিক বলেছিস, ঝি-চাকর, যেন আমাদের আর কোন নাম নেই। আমরা যেন মানুষ নয়।

এর মধ্যে ও-পাশের লাগোয়া কামরার বাবুরা দাবড়ে তর্ক করে যাচ্ছিলেন। আই এম এফ লোন, প্যালেস্টাইন ক্ষত বিশ্বশান্তি সমস্যা, অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, ভারতবর্ষের বিপ্লব। তাঁরা চেঁচিয়ে ডাক দেন—

'একটু আস্তে—'

বিছুনি তাতে ভ্রুক্ষেপও করে না। হঠাৎ কেমন যেন সে জ্বলে যায়।

'জানিস, আমার এক বাড়ীর মাসিমা আছে, পাঁচ মিনিট দেরী দেখলেই গিলে ফেলতে চাইবে।'

'চাকরী করে?' মেনি শুধোয়।

'হ্যাঁ চাকরী করে, মেয়েদের কি একটা পার্টিও করে। খালি বাড়ীতে ভদ্দর ঘরের মেয়েদের ভীড় লেগেই থাকে। নারীমুক্তি না কি ব্যাপার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝগড়া। অথচ কতা শুনলে তোর গা পিত্তি জ্বলে যাবে। আমরা তো খলবল করে কাঠ কাঠ কতা বলে যাই। অত মিষ্টি কথা জানিনে। আর ও এমনভাবে মিঠা কথার হুল ফোটাবে না, মনে হবে এক্ষুনি কাজ ছেড়ে দিয়ে ঝাড়ু মেরে চলে যাই—

মনা বলে—'ধুর! আমার একদম ভাল্লাগে না। পরের এঁটো ঘেঁটে জেবন কাবার। ইদিকে মরা বাপটা শকুনের মোতন বসে আছে হাঁ করে। টসকাও না বাবা—'

মেনি বাধা দেয়—'ওরকম বলিসনি।'

মালতি হঠাৎ অন্ধকার পরিবেশটার ওপর হাজার ভোল্টের বিজলী বাতির মত ঝিলিক মেরে ওঠে—

'এখনো বিছুনির কতা শেষ হয়নি।'

ওপাশ থেকে চিৎকার ভেসে আসে 'চোপ মুখ সেলাই করে দোবো একদম।'

বিছুনি কান দেয় না। মুখ বেঁকিয়ে বলে—'এই বিছুনি শুনে যা।'

'এলম।'

'কী?'

'খাটের তলাটা ভালো করে ঝেড়ে ঝাঁট দিয়েছিস? একগাদা ময়লা রয়েছে এখনো, দে ভালো করে ঝাঁট দিয়ে নে, গায়ে কাজ লাগে না একদম। যত্তসব নোংরার জাত।'

অন্যেরা হাঁ করে গেলে। বিছুনি বলে—'দ্যাখ আমি তখন টেরেন ধরবো। একবার ঝাঁট দিইছি তবু আবার ঝাঁট দেওয়াবে। মাথাটা খারাপ হয়ে যায় আমার। তবু একটু খেতে টেতে দ্যায় বলে কিছু বলিনা। কিন্তু হাড় গলানো কতায় বড়ো লাগে। আর সব চেইতে খারাপ লাগে অফিস টেমের সময়।'

'কেন রে?'

'অফিস টেমের সময় বাজার করা নিয়ে মাসিমা মেসোমশায়ে একেবারে দা কুমড়ো। চোখ পাকিয়ে মাসিমা বলে এটা এনেছো কেন ওটা আনতে পারতে এটা ফেরৎ দিয়ে এসো। ব্যস লেগে গেল খ্যাচাখেঁচ। কোন কোন সময় মেসোমশাই ব্যাগ হাতে না-খেয়ে না-দেয়ে অফিস বেরিয়ে যায়। মাসিমা দরজার গোড়ায় এসে গলা ছেড়ে চ্যাঁচায়—

'এই পিণ্ডি যে রান্না করলাম এত কষ্ট করে এগুলো কে গিলবে? যত বুড়ো হইতিসে তত ঢং বাড়সে। ঝি-চাকরদের সামনেও তেজ।'

এবার আসরে অবতীর্ণ হয় কলেজ পড়ুয়া নির্ভেজাল ভদ্রসন্তান একটি। এতক্ষণ বাজখাঁই গলায় কম্পার্টমেন্টের ভেতরটা প্রায় দাবড়িয়ে রেখেছিল সে। সর্বহারার শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধীয় কথাবার্তায় তাকে ছেদ দিয়ে এদিকে আসতে হয়েছে। উস্কোখুস্কো চুলে, দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে আর কাঁধের ঝোলায়

একটা উগ্র বুদ্ধিজীবী সুলভ উষ্মার ছাপ।

'কী হচ্ছে কি এখানে?'

'কেন?' জবাব দেয় বিছুনি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ করে এমন বত্রিশ পাটি মেলে ধরেছো কেন?'

মেনির তীক্ষ্ণ উত্তর সাঁ করে ছুটে আসে—'ওমা, গুণে দেখেছে গ।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় ছেলেটার, মাথায় খুন চাপে।

'চ্যাংড়ামী করার জায়গা পাওনি, না?'

'চ্যাংড়ামো তো আপনি করলেন। আপনাদের ওখেনে যে গলা ছেড়ে চেঁচাছেন, কই আমরা তো ওখেনে যাইনি—

'ওখেনে কি কথা হচ্ছে তা তোদের মত ঘুঁটে কুড়ুনির মাথায় ঢুকবে? বিদ্যের জাহাজ।'

'ঢুকবে কি করে? আপনাদের মতোন তো লেখাপড়া শিকিনি। ঝি-চাকরদের জাত যে।'

'ওসব সেণ্টিমেণ্ট বাড়ী গিয়ে মারাও গে।'

বিছুনি ঘুরে দাঁড়ায়।

'মুখে লাগাম দ্যান।'

এগিয়ে আসে আর একজন।

'আঃ দূর! তুই ছাড়তো, অতো ভদ্রভাবে কথা বললে হবে না। আমায় ছেড়ে দে, আমি ট্যাকল করছি। অ্যাই, দাঁত কেলানো বন্ধ করো নইলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দোব।'

'এঃ এলেন আমার বাজারে, ওনার কতায় যেন খাই পরি। মুখের ময়লা ঝাড়ুন।'

'শালার মেয়েছেলের নিকুচি করেছে, খাসতো পরের বাড়ীর ঝি-গিরি করে—'

এমন সময় সর্বহারার মহান নেতা এবং শ্রেণী সংগ্রামের জব্বর যোদ্ধা পূর্বোক্ত কলেজ পড়ুয়াটি বলেন—

'ম্যাথরানির আবার মহারানীর ঢং, মারবো দু ঝাঁপড়, খলবলানি বন্ধ করে দোবো।'

বিছুনি ধারালো হয়ে ওঠে ক্রমশঃ—'বাড়ীতে গিয়ে ঝাঁপড় মারেন।' ওপাশের বুড়ো তখন আহ্লাদে গলগল করে ঘামছে। বুকের খাঁচায় অনেক

হাওয়া ভরে নিয়ে এপাশ ওপাশ করে সে রণক্ষেত্রে পৌঁছুতে চায়। কিন্তু ভীড়ের চাপে বুড়ো আবার সসেমিরা হয়ে ঝুলতে থাকে।

কিছু কিছু কৌতূহলী মুখ জমে আসে এদিকে, ভীড়ের বাঁধন এদিকে এঁটে গিয়ে ওদিকে আলগা হয়ে যায়। এই অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পাঁচ-ছটি মেয়ে তাদের সংস্কৃত অসংস্কৃত পাঁচমিশেলী শব্দের তোড়ে প্রায় কিচিরমিচির শব্দ করে তাদের প্রতিবাদ জানায়। বিপরীত দিকে প্যাঁচালো মিঠা শব্দের কেতায়, শরীরের বিচিত্র কায়দায় এবং অপরিসীম খিস্তি খেউড়ের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে সেই রাজনৈতিক তত্ত্বাগীশের দলটি কম্পার্টমেণ্ট গরম করে রাখে। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রায় সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে পাঁচ-ছটি নিতান্ত আটপৌরে মেয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় পরাজয়ের মুখে।

এদিকে টেরেন তখন শিয়ালদার খোপের ভেতর বেপরোয়াভাবে ঢুকে পড়েছে। তখনো বিছুনি সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। অসহায় প্রতিবাদে তার গলার নলী ফুলে ফুলে উঠছে।

কিন্তু টেরেনটা ঢুকে পড়তেই সে সম্বিৎ ফিরে পায়। ভদ্দরলোকেদের মন্তব্যের ব্যূহ ভেদ করে সে নেমে পড়ে শেয়ালদায়।

নেমেই দৌড় প্রতিযোগিতা। অফিস টেম সামাল দিতে হবে। এদিকে বেয়াড়া গোছের ভদ্রলোক ছেলেটা তখন তার পেছনে ছুটিয়ে দ্যায় কটূক্তির কুকুর—'আয়, আয়, চো, চো—'

ছুটন্ত অফিসবাবু, কেরানী, মাস্টার, নেতা, ব্যবসায়ী, দালাল, বড়োবাবু ছুটতে ছুটতেই এক গাল হেসে নেয়। ছেলের দঙ্গলের ভেতর থেকে একজন হাঁক দিয়ে ওঠে—

'লাইনের মাল, যাবে কোথায়। কিছুতেই বেলাইন হতে দোবো না।'

(৩)

'এত দেরী?' চ্যাটার্জীবাবুর বৌয়ের গোল মুখটা আরো গোল দেখায়।

সে কোন উত্তর দিতে পারে না। অনেকগুলো কথা মুখের কাছে উঠে আসে তার। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়। কিন্তু তবু সেই কথাগুলো কেমন আড়ষ্টতার খোপরে বন্দী হয়ে থাকে। ছটফট করে।

'তোর কোন দায়িত্বজ্ঞানও নেই? রোজ রোজ তোর লেট?'

নিতান্ত একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ ভেতরে মোচড়াতে মোচড়াতে হঠাৎ যেন

ছাড়া পেয়ে যায়—

'টেরেনটা বড্ড লেট করলো।'

'টেরেন তো আর তোর জন্য বসে থাকবে না। একটু আগে বেরোতে পারিস না?'

ওপাশ থেকে ভেসে আসে গিন্নীর মেয়ের হাসি—

সকাল আটটার এই আরামের বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে গড়াতে গড়াতে সে বলে—'লেট হবে না? ঘুমোবে মড়ার মতো। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোলে কি আর ঠিক সময়ে কাজে আসা যায়। ওকে শোয়া রোগে ধরেছে।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বাসন নিয়ে বসে বিছুনি। কখন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। এই সময়টুকু তার একান্ত নিজস্ব। নিজস্ব এই সময়ে তার অভ্যস্ত হাত এঁটো বাসনের শুকনো আঠালো রুক্ষতাকে ঘষে ঘষে নরম করে। নির্মম ভাবে খড়ের ন্যাতার রগড়ানি দিতে দিতে একটা তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহায় তার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন উন্মুখ হয়ে ওঠে। যেন দু হাত দিয়ে সে টেরেনের সেই ভদ্দরলোকেদের ছোটলোক ছেলেগুলোর মুখ রগড়ে দিচ্ছে।

কয়েকটা বাসন ঘরে রাখতে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চেহারাটা ভেসে ওঠে। নিতান্ত অনিচ্ছায়ও সে একবার নিজের উনিশ বছরের ফুটেও না ফোটা শরীরের দিকে তাকায়। ভীষণ একটা কণ্ট ঘুরপাক খায় কোথায় যেন।

লক্ষ্মী মাসীর জোয়ান কথাটা লাফ দিয়ে এসে তাকে ধাক্কা মারে। ন্যাতা দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে একটা গনগনে রাগ ক্ষেপে ওঠে তার মনে। সমস্ত রাগ বাসনের ওপর গিয়ে পড়ে তখন, বাসনের শরীরে শব্দ ওঠে ঝনাৎ ঝনু। আর নিজের ভেতর শব্দ ওঠে ঘেন্নার। পোড়া কপালটার ওপর বিতৃষ্ণা। অন্ধ বাবা আর পেটে দুরারোগ্য ঘা নিয়ে মা। তিন বাড়ীতে নব্বুই টাকা রোজগারের জন্য মুখে রক্ত তোলা। দুপুরেও সে একটু ঘুম বা বিশ্রাম পায় না। অথচ বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের বেবাক অবসর। দুফরের ঘুম। মাখম মাখম শরীরের চামড়ায় যোবনকে ধরে রাখার কত বেবস্থা। ম্যাচ করা শাড়ী বেলাউজ। এর পাশে নিজের এই ছোটোখাটো মলিন অস্তিত্ব, হাতের আঙুলগুলোয় ক্ষীরের কামড়, পায়ে শ্চতুর হাজার সূক্ষ্ম আক্রমণ, কুড়ি টাকা দামের শাড়ীর কিনার জুড়ে বাটনার ছোপছোপ দাগ—ধুলো-কালির নিত্যি জোড়ে যাওয়া চ্যাটচেটে ভাব লোকের গালিগালাজ—সব মিলে একটা হীন

লজ্জা তাকে ছেঁকে ধরে এই সময়ে।

অথচ মাঝে মাঝে ঠিক এই সময় তার যোবন ফিরে আসতো। একটু একটু করে কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠবার চেষ্টা করতো সে। পায়ের তলার ঘাস মাটি, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা চাঁদ তখন উনিশ বছরের সবটুকু রং মেখে নিতো। নিত্যিদিন যাওয়া আসায় যে দৃশ্যকে সে কোনোদিন তাকিয়েও দ্যাখেনি সেইসব দৃশ্যের জীবন ভাষা পেতো তার শরীরে। স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে সে তরতর করে উঠে যেতো অনেক ওপরে। মনের রুক্ষ মরুভূমিতে তিরতির করে আশার একটা স্নিগ্ধ স্রোত বইতো। সে কাদা হয়ে যেতো ক্রমশঃ……

অথচ আজ তার কোনোকিছুই ভালো লাগছে না।

দমকা হাওয়ায় স্মৃতির পথ জুড়ে এগিয়ে আসে একটা মুখ। পরেশ না কি যেন নাম। ঠিকে মিস্তিরি। চোঁয়াড়ে মুখ, গড়াই পেটাই চেহারা। দুটো গর্তে ঢোকা চোখ। বিছুনির মনে পড়লো হ্যাবলার মত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ায় সেই বোকা বোকা করুণ মুখের হঠাৎ অন্য দিকে বেঁকে যাওয়া। কি যেন হারিয়ে ব্যাগ হাতড়ানো। বিছুনি আপন মনেই ঝামটিয়ে ওঠে—'পেরেম। নুড়ো জেবলে দিই অমন পেরেমের মুখে। নাথি মারি শালাদের মুখে, কি খাওয়াবি রে? দুদিন বাদে তো সেই বাবুদের বাড়ীর ঝি-গিরি করতে করতে জেবন কাবার। তা তোর দাসী হোবো কোন দুঃখেরে মড়া? নিজেরে খাওয়াতি পারে না, আবার আসে আমায় বে করতে।' রাগের মাথায় মুখটা ঘুরিয়ে নেয় সে। এখন আবার সেই টেরেনের দুটো ছেলে। নোংরা সিগরেট ফোঁকা ঠোঁটের ওপর সরু এক সুতো গোঁফ। কায়দা করে জুলফি কাটা। কানচাপা চুলের বোঝার খোলে সেঁটে থাকা মাংসহীন গালপাট্টা। আর ওই পড়ুয়া ছেলেটা, তারপর ওই বুড়োর জাত তুলে গালাগাল।

'কিরে? এখনো তোর হোলো না?'

'না।' এমন উত্তরের ধাক্কায় গিন্নী কেমন অসহায় হয়ে পড়ে।

'কি বললি?'

'বললাম হয়নি।'

'কেন?'

'লেট করে এসেচি তাই।'

চ্যাটার্জী'বাবু দাড়ি কামাতে কামাতে এগিয়ে আসে—

'একটা কথাও বলবে না। লেট করে এসে আবার ন্যাকামি হচ্ছে।

গিন্নী বলে—'দেখছো, কেমন মুখে মুখে কথা। যেন ও আমায় মাইনে দিয়ে রেখেছে। ঝি-চাকরের আস্পর্ধা দেখেছো আজকাল!'

মাথা ঘুরে যায় বিছুনির।

'বারবার ঝি-চাকর ঝি-চাকর করবেন না।'

তেড়ে আসে চ্যাটার্জী'বাবু—'কেন, ঝি-চাকরের কি রাজরানী হওয়ার শখ হয়েছে? চাকরকে চাকর বললে তাতে গায়ে ফোস্কা পড়ে কেন?'

মেয়ের নরম মাংসের তালের মত মুখ লাল হয়ে যায় উত্তেজনায়। সে বলে—'জানো বাপি, আজকে সোশ্যাল সায়েন্সের ক্লাসে এই ঝি-চাকর ক্লাসটাকে মজুলাদি ভয়ানক বলে বর্ণনা করেছেন। এরা নাকি ভীষণ নেমকহারাম হয়।'

চ্যাটার্জী'বাবু দ্বিগুণ উৎসাহে মেয়ের কথার সমর্থন জানান—'অব কোর্স। এই চাকর ক্লাশটার বৈশিষ্ট্যই হোলো—'

বাধা দেয় বিছুনির উচু গ্রামের প্রতিবাদ।

'আপনিও তো চাকরী করেন। আপনাকে কি অফিসে চাকর বলে?'

একটা ভীষণ ভারী নৈঃশব্দ নেমে আসে ঘরের মধ্যে। চ্যাটার্জী'র হাতে সেফ্‌টিরেজর. গালের একপাশটা কামানো। এশিয়ান পেন্টস্‌-এর অ্যাডভার্টাইজ হয়ে যান তিনি।

গিন্নীর হাতে খুন্তি। কড়াইতে তেল পোড়ে।

মেয়ের হাতে ডটপেন—হাত ফস্‌কে মাটিতে পড়ে যায়।

'এক্ষুণি এখান থেকে দূর হয়ে যাও'—হেঁকে ওঠেন চ্যাটার্জী'।

'যাচ্ছি। মাইনেটা দিয়ে দিন।'

'একটা পয়সাও পাবে না।'

'রীতিমতো খাটুনির পয়সা। কেন দেবেন না?'

'কোনো কথা শুনতে চাই না। গেট আউট্‌।'

'অতো ফড়ফড় করে ইংরাজী বলবেন না। বুঝি না। মাইনেটা দিন।'

'আগে গেটের বাইরে যাও। একটা পয়সাও পাবে না।'

'যাচ্ছি। কাল কিন্তু পঞ্চাশটা মেয়ে নিয়ে আসবো। আমি একা নয়।'

'হাঁ, হাঁ, যাও যাও।'

দুম দুম করে পা ফেলে বিছুনি নেমে যায় নীচে। তারপর কলেজ স্ট্রীটের

মাসীমার বাড়ীতে কড়া নাড়ে।

ঘটাং করে দরজা খোলে দুটো রাগী হাত।

'ক'টা বাজে?'

'ন'টা।'

'ক'টার সময় আসার কথা?'

'সাড়ে আটটা।'

'আধ ঘণ্টা লেট করে কি এখানে ইয়ার্কি মারতে এসেছো, না গতর দুলিয়ে দেখতে এসেছো আমার হাড় মাস কেমন ভাজা ভাজা হচ্ছে?'

'রোজ রোজ ঠিক সময়ে টেরেন আসে না।'

'আমার কিন্তু রোজ রোজ ঠিক সময়ে কাজে না আসলে চলে না।'

'আপনি কি রোজ ঠিক সময়ে কাজে যেতে পারেন?'

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায় মুখের ওপর। মাসীমার মুখে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। রাস্তায় নামে বিছুনি। এবার সরকার বাড়ী।

সরকার বাড়ীর পুরোনো দরজার রংচটা শরীরের ওপর অন্যমনস্ক ভাবে মারতে গিয়েই থেমে যায় বিছুনি। ভেতরে তুমুল ঝগড়া।

'নাকে মুখে রক্ত তুলে রোজগার করি তো, তাই টাকার দাম বুঝি।' দাদার গলা।

'কেন, আমাকে বুঝি তোমার সংসার একেবারে শো কেসে সাজিয়ে রেখেছো। বিয়ের পর থেকে সেই যে তোমাদের হেঁসেলে এসে ঢুকেছি। তারপর থেকে হাঁড়ির হাল যখন এই আলুসেদ্ধতে এসে ঠেকেছে তখনো তো ঠেলে যাচ্ছি পুরোনো নড়বড়ে এই গুষ্টির গরুর গাড়ী।'

'ওঃ! কাবার ছররা ছুটছে একেবারে। রাজরানীর কি আবার গাড়ী চড়ার শখ হয়েছে নাকি?'

'গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান আবার গাড়ী চড়ার স্বপ্ন দ্যাখে কি করে?'

'ঠেস দিয়ে কথা বোলো না বলছি। এইভাবে থাকতে হলে থাকো না হয় বেরিয়ে যাও প্রাইভেট কারের খোঁজে।'

'কেন, বেরিয়ে যাবো কোন দুঃখে শুনি? যাবো যখন তোমাকে শেকড়শুদ্ধ উপড়িয়ে তবে যাবো।'

'মুর শালা বাড়ীর নিকুচি করেছি। থাকবো না শালার এখানে।'

'যাবেতো এই তিনটে ছাগলের যে জন্ম দিয়েছো সেগুলোকে নিয়ে যাও।'

'কেন ওগুলো কি আমার?'

'তো কার? মাসের সাত তারিখে ওনার একটিও পয়সা থাকবে না। আর আমাকে এই ছাগলদের হরেকরকম খোঁদলানো সইতে হবে। এখনো ঝিয়ের মাইনে দেওয়া হয়নি।'

'চেঁচিও না।'

'একশোবার চ্যাঁচাবো।'

'এখুনি বিছুনি এসে পড়বে। শুনতে পাবে। ঝি-চাকরের সামনে এভাবে চিল্লিও না!'

'ও হো, হো, হো, বাবু আমার। সব বাবুদের দেখা হয়েছে। এদিকে ছেঁড়া কাপড়ে তালি মেরে বাবু সাজা আর ওদিকে ঝিয়ের সাথে নিজের দূরত্ব রাখা। এসব ভণ্ডামি আর কতদিন চালাবে? এমন লুকোচুরি খেলা?'

'ফ্যাক্টরিটা সামনের মাসে বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তারপর?'

'অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা করছি। বিছুনিকে এমাসেই না বলে দাও।'

'তারপর?'

'ববির দুধটা বন্ধ করে দিতে হবে।'

'তারপর?'

'মলিটার স্কুলে যাওয়াও বোধ হয় বন্ধ হবে।'

'বাকী?'

'গলাটা কমাও। এখুনি আসবে বিছুনি। র‍্যাশন ধরার জন্য যে কুড়িটা টাকা তোমার কাছে আছে তার সাথে এদিক ওদিক থেকে আর দশটা টাকা যোগ দিয়ে ওকে বিদেয় করে দাও। কিছু বলবার দরকার নেই।'

'এখনো লুকোবে? তোমাদের এই বাবু নামটা বেশ মানিয়েছে! কি বলো?'

'আঃ আস্তে! সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।'

'কিন্তু যখন আর কোনো আড়াল থাকবেনা নিজেকে লুকোবার। যখন আমাকেও এই ভাঙাচোরা সংসারের পোষ্য জীবগুলোর মুখে দুটো ভাত তুলে ধরবার জন্য ওই বিছুনিদের সাথে একই লাইনে দাঁড়াতে হবে তখন বিছুনিদের সাথে নিজেকে তফাতে দাঁড় করাবার মাটি থাকবে কি? বাবু?'

সরকার চুপ করে যায়।

বিছুনি আস্তে আস্তে রাস্তায় আসে। তারপর ছ'টা বাহান্নর পরিচিত কামরার দিকে পা বাড়ায়।

প্রবন্ধ

গ্রাম নিয়ে ভাবতে বসে

অমিত সরকার

শতকরা সত্তরজন ভারতীয় যখন কৃষি নির্ভরশীল, জাতীয় আয়ের পঞ্চাশ শতাংশ আসছে কৃষি থেকে, স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রের নজরদার কৃষি দুনিয়াতে থাকতে বাধ্য। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র নায়কেরা তাই কৃষির উন্নতি, সবুজ বিপ্লব, গ্রামীণ অর্থনীতি, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে করেছেন নানা জল্পনা কল্পনা, কখনো বা হৈ চৈ করেছেন মাঠে ময়দানে, পার্লামেণ্টে কিন্তু অবস্থা সেই তিমিরেই। আমরা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করছি সামন্ততন্ত্র এখনও বর্তমান, রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলছি 'আধা সামন্ততান্ত্রিক' যদিও আমরা জানি কৃষি অর্থনীতিতে বৈদেশিক পুঁজির অবাধ বিচরণ শুরু হয়েছে।

কতকগুলো প্রশ্ন নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করবো যেমন সামন্ততন্ত্র থেকে পরবর্তী স্তরে উত্তরণ ঘটেছে কি না, ঘটে থাকলে তা কিভাবে, গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সংস্কার করা হয়েছে বা ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে তার চরিত্র কি এবং সর্বোপরি আমরা আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত করে পশ্চিমবাংলা ভিত্তিক করবো, বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো বর্তমান কালে বামফ্রণ্ট সরকার গ্রাম নিয়ে ভাবতে বসে পঞ্চায়েত, অপারেশন বর্গা ইত্যাদি নিয়ে অনেক তো সংস্কারবাদী পদক্ষেপ নিলেন বা নেওয়ার চেষ্টা করলেন, এমন কি ওঁরা ঐসব ব্যাপারে মৌলিকতার দাবীদার হিসেবে নিজেদের ঘোষণাও করলেন—কিন্তু কতোটা সফল হোলেন; না শুধু শুধু সফলতার ঢেঁকুর তুললেন কিংবা কেনই বা সফল হোলেন না, সীমাবদ্ধতাটা

কোথায় ইত্যাদি। সুবিধার জন্য আমাদের আলোচনা কতকগুলি অংশে ভাগ করে নেওয়া যাক্।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা—প্রয়োজনের পরিবর্তন ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা: অর্থনৈতিক দিক থেকে সামন্ততন্ত্রের চারিত্রিক পরিবর্তন দ্রুত লক্ষ্য করা গেলেও সামাজিক ভাবে তা এসেছে প্রচ্ছন্নভাবে। এ ধরনের পরিবর্তনতার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়ে ওঠা অপরিহার্য সমাজ সংগঠনটিই হলো পঞ্চায়েত, তাই পঞ্চায়েতের বিবর্তন ঘটেছে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠা মোড়োল কেন্দ্রীক সংগঠনটি পরবর্তীতে পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রের একটি শোষণ ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্রেরই একটি অংশ, অর্থাৎ প্রান্তিক এজেন্টে। আদিম সরলতম রূপটি এখনও নজরে পড়ে উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে। রাজতন্ত্রের অধীনে এবং পরবর্তীকালে সামন্ততন্ত্র উন্মেষের প্রাক্কাল থেকেই রাষ্ট্র করগ্রাহী হিসেবে দেখেছে কৃষি অর্থনীতিকে। উচ্চবর্ণের যারা কিনা সমাজের নিয়ন্ত্রক সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে কৃষি উৎপাদনের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন উপসত্ব এবং মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে পঞ্চায়েতকে। 'নিম্নবর্ণের কেউ কখনো বা রাজা হলে সিংহাসনের স্বাদে সেও একইভাবে শ্রেণী সম্বন্ধে আক্রান্ত হয়েছে।" ফলতঃ গ্রামীণ অর্থনীতি গিয়েছে ভেঙ্গে, অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছে নানা অসন্তোষ। কৃষক সংগঠন এবং কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস বড় কম নয়, শোষণের মাত্রা বাড়বার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হয়েছিলো ছোট খাটো কৃষক বিদ্রোহ এবং সম্ভব মতো তা দমন করে চলেছিলেন প্রায় ব্রিটিশীয় রাজা মহারাজারা। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ এসেছে উপনিবেশের পাকাপোক্ত ঘাঁটি হিসেবে। তখন চিরন্তন দমন পীড়নকে আরো একটু সুশৃংখল করতে হয়েছে তাদেরকে। কারণ দু'টো, এক হচ্ছে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাকে মুনাফা লুঠতে হলে সমান রকমের শৃংখলিত একটি শোষণ যন্ত্র রাখতেই হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে মুনাফা লুঠতে হলে উৎপাদনকে ইচ্ছামতো না হাত দিয়ে, রাষ্ট্রের মনোমতো উৎপাদনে কৃষকদের বাধ্য করার তাগিদে দরকার একটা কেন্দ্রীভূত লেঠেল ব্যবস্থা, ব্রিটিশরাজ গোড়ার দিকে এই দুই চাওয়াকে বাস্তবায়িত করতে আমদানী করে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এবং সামন্ততন্ত্রের স্থিতিশীল অবস্থা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আবদ্ধ ভূমিব্যবস্থা ইংলন্ডের মিলগুলোকে জুগিয়ে যাচ্ছিল নীল, পাট, রেশম, ফলতঃ বৃত্তি নির্ভর কারিগর

শ্রেণী ক্রমশঃই হয়ে পড়ছিলো কৃষি শ্রমিক।

অন্যদিকে ঔপনিবেশিক বিকাশে তৎপর ব্রিটিশেরা দোসর হিসেবে পেয়ে যেতে থাকে এদেশের বাণিজ্যিক পুঁজি, জমিদার শ্রেণী থেকে আগত শিল্প-দ্যোগী উচ্চবর্ণের মানুষদের। স্ব-প্রক্রিয়া ব্যতীত ধনতন্ত্রের এই বিকাশে ক্ষতিগ্রস্ত হোতে থাকে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষক বিদ্রোহ দানা বাঁধে। অতএব অসন্তোষ দমন, চলে আসে গ্রামীণ রক্ষীবাহিনী। ১৮৭০ সালে প্রণীত হয় 'বেঙ্গল চৌকিদারী এ্যাক্ট', জমিদার শ্রেণীর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে, এভাবেই জন্ম নেয় চৌকিদারী পঞ্চায়েত, যার পথ দিয়েই পরিবর্তিত হয়ে আজকের পঞ্চায়েত। ১৮৮৫ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে চালু করা হলো নানাবিধ এ্যাক্ট। কাজ সেই একই, কৃষকদের পয়সায় কৃষক দমন বাহিনী যা আইনের মোড়কে সাংগঠনিক করা হলো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, যখন শোষণের মাত্রা বাড়তির দিকে এবং ব্রিটিশ বুদ্ধি-মানেরা বুঝে নিয়েছে যে ভারতীয় গ্রামই তাদের স্বর্ণ ডিম্ব তখন থেকে তারা প্রশাসন তথা শোষণ ব্যবস্থাকে আরও বলিষ্ঠ করতে থাকে। ১৮৮৫ সালে 'বেঙ্গল লোকাল সেলফ্ এ্যাক্ট'-এর সাহায্যে জেলা স্তরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মহকুমা স্তরে লোকাল বোর্ড গঠন করা হয়। সমাজের প্রতিষ্ঠিত লোকেরা তাদের শিক্ষা, করদান, বাসস্থান প্রভৃতির ভিত্তিতে গঠন করে ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ড—এরা মূলতঃ শিক্ষা, জল, খাদ্য এবং তার পাশাপাশি কারিগরী কর্মচারী নিযুক্ত করে। অন্যদিকে লোকাল বোর্ডের এক্তিয়ার ছিলো বিশেষ অবস্থায় (খরা, বন্যা ইত্যাদিতে) অনুদান দেওয়া। গোটা ব্যবস্থাতে অর্থ যোগাতো গ্রামবাসীরা আর ভোগের দরজায় পাত পেড়ে থাকতো উচ্চবর্ণের সামন্তপ্রভুরা। অর্থের অভাবে সীমাবদ্ধ হতে থাকে উক্ত বোর্ডগুলি। লোকাল বোর্ড সর্বপ্রথমেই হারিয়ে যায়, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বাঁচতে চায় বড়ো মানুষের টানে, অবশেষে বেঁচে থাকে ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড নামে।

তৃতীয় পর্যায়ে, যখন শোষণের মাত্রা আরও বাড়তির দিকে বিচক্ষণ ব্রিটিশ জনগণকে কব্জা করার পরিকল্পনায় একটা নতুন চাল চালে, যা হচ্ছে জাতীয় নেতৃত্বের আত্মবিকাশের পথ। সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে জাতীয় শোষকদের গলাগলি হওয়ার ফলে শোষণ যন্ত্র হয় আরও পরিকল্পিত। তাই দেখি ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের মাধ্যমে উঠিয়ে দেওয়া হয় চৌকিদারী পঞ্চায়েত।

খাতায়-কলমে ইউনিয়ন বোর্ডগুলোকে দেওয়া হয় কিছু বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা আর পয়সার কাছি সেই একই তীরে বাঁধা থাকে। সুতরাং আর্থিক অসংগতি ইউনিয়ন বোর্ডেরও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসে।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ৪৭-এ ভারত স্বাধীনতা পায়, ব্রিটিশের ছেঁড়া জুতো পড়বার সৌভাগ্য অর্জন করে, ততোদিনে ভারতীয় সিস্টেমে এসে পড়েছে জমিদার ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অম্লমধুর সম্পর্ক, অন্যদিকে স্বাধীন কৃষক কুলের ওপর বর্তেছে দেশ গড়ে তোলার স্বেচ্ছাশ্রম। ভারতীয় শাসকশ্রেণী মিশ্র অর্থনীতির ডাক দেন, বিস্তর পুঁথি পত্রে তার আপাদমস্তক ঘর্ষণ চলে, আসল সত্যটা চাপা পড়ে থাকে। বুর্জোয়া শ্রেণী অসুবিধা-জনক বৃহৎ শিল্পক্ষেত্র সমূহ ও অধিক পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি রাষ্ট্রকে শিখণ্ডী করে 'পাবলিক সেক্টর' হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপনা করে এবং যেহেতু সরকার তাদেরই প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত, ব-কলমে এ-ধরনের সংস্থাগুলির সকল সুবিধা ভোগ করে তারা, কিন্তু সমস্ত ঝুঁকি এসে বর্তায় সাধারণ জনগণের ওপর।

এ হেন অবস্থায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে তারাও চাখতে চায়, ব্যাপারটার পরিবর্তন ঘটাতে চায়। ৪৭-এর আগে ভারতের কৃষি ব্যবস্থা একটা পিরা-মিডের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। যার মূল তিনটি ধাপে ছিলো যথাক্রমে মালিক, কৃষাণ ও কৃষিমজুর। এছাড়া সিমেন্ট বালি পাথরের কাজ করতো হাজারো রকমের ফড়ে দালাল। যার জন্য উৎপাদনের একটা বড়ো অংশ চলে যেতো বেশ কিছু অনুৎপাদক শ্রেণীর হাতে, মোট আয় যেতো যথেষ্টই কমে। ভারতীয় শাসকেরা এ ব্যাপারটা বদলাতে চায়—এ কারণে কখনই নয় যে তারা কৃষক শ্রেণীর গলা থেকে শৃংখল মোছাবার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলো, এটা এই কারণে তারা সমাজের প্রধান সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত (Chief potential economic surplus)-কে বাড়াতে চেয়েছিলো এবং সেটা সম্ভব তখনই যখন থেকে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা ও জমিদারী এবং মধ্যস্বত্বের উচ্ছেদ হবে সুনিয়ন্ত্রিত। এসব সাত পাঁচ ভেবে তারা পঞ্চায়েত নিয়ে নতুন করে ভাবতে বসে।

ভারতীয় সংবিধানে ৪০তম অনুচ্ছেদে নির্দেশমূলক নীতিতে বলা হয়—The State shall take step to organise village Panchayats and to endow them with such powers and authority as may be

necessary to enable them to function as units of self Government.

এইখানে এসে আমরা এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখি, বুর্জোয়ারা সবুজ বিপ্লবের আহ্বান দেয়। এটা আমরা জানি এ ধরনের বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বৈপ্লবিক কার্যসমূহ সর্বদাই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সামন্ততন্ত্রের পাহাড়প্রমাণ বাধা থেকেই যায়। সবুজ বিপ্লবের সবুজ ইশারা থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনা কি করে ঘটে আশ্চর্য হয়ে যাই। মুৎসুদ্দি চরিত্রের বুর্জোয়াদের সাথে কোনোরূপ বৈরীমূলক দ্বন্দ্বই চোখে আসে না, কিন্তু যা নজরে আসে তা হলো কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলে। এ ব্যাপার কিছু সময় পরেই আবার আলোচনা করবো। ইতিমধ্যে ১৯৫৭ সালে বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটি সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীতে পঞ্চায়েতের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে। তা হলো—

(১) গ্রাম, ব্লক এবং জেলা স্তরে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সংগঠন গঠন।

(২) প্রত্যেক পরিকল্পনা ও উন্নতি মূলক কর্মসূচী সমূহ রূপায়ণ।

(·) তাদের কর্তব্য পালনে সফল হবার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদ প্রদান।

ওই বৎসরই ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত এ্যাক্ট '৫৭-এর মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রাম ও ইউনিয়ন ভিত্তিক দ্বি-স্তর করা হোলো। প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে গঠন করা হোলো অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত। নিঃসন্দেহে এই প্রথম গ্রামকে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হোলো, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পরিলক্ষিত হোলো কিন্তু এই বিকেন্দ্রীকরণের সাথে অর্থনীতির সংস্রব না থাকায় উক্ত ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়লো। এর মূল দ্বন্দ্বটা হোলো মুৎসুদ্দি চরিত্রের বুর্জোয়ারা শিল্পদ্যোগী হোলে, অসংগঠিত জোতদার শ্রেণীর ক্ষমতা ছিলোনা তাদের সাথে পাল্লা দেওয়া, উপরন্তু জাতীয় নেতৃত্বের নজর মূলতঃ ছিলো নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ওপর। গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েত তাদের কাজ সীমাবদ্ধ করে বেঁচে থাকে কেবল আপৎকালীন রিলিফ বণ্টন এবং চৌকিদার দফাদারদের মাসোহারা বণ্টনের ওপর।

১৯৭৩ সালে পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবা হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের বাধ্যতামূলক কর্তব্য (obligatory)

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছাধীন কাজ (discreationary)

(গ) রাজ্য সরকারে দায়িত্ব দেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্তব্য (assigned)

উল্লেখ্য, (গ) কাজের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য বা নির্দেশ দেন তাহলে সেই দায়িত্ব যথার্থ পালন করার জন্য বা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য বার বার গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেবেন।

তবে এই আইনকে আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিলো রূপায়িত হোতে। ১৯৭৮ সালে ৪ঠা জুন ২৫০ লক্ষ গ্রামীণ জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে ৫৬০০০ পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ঠিক করে, এই নির্বাচন হয় ত্রিস্তরে। এই নির্বাচন পরবর্তীকালে পঞ্চায়েত গঠন এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন মৌলিক দিক আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে, যথাসময়ে পঞ্চায়েতের আরো একটি নির্বাচন হয়েছে তাতেও বামফ্রন্টের ঢাকেই বাড়ি পড়েছে। ১৯৭৮—'৮২ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তারা অনেক কাজই করেছেন, সত্যি বলতে কি পঞ্চায়েত নামক সংগঠনটি একটি 'Living System' বলে প্রতিভাত হয়েছে সাধারণ জনসমক্ষে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার সংস্কারবাদী কাজকর্ম করেছেন, একথা অতিবিরোধীরাও স্বীকার করবেন। যেমন ধরুন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প রূপায়ণ, বয়স্ক শিক্ষার জাতীয় কর্মসূচী, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী (যেমন সড়ক, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরী বা মেরামত, নলকূপ খনন, পানীয় জল সরবরাহ) কিংবা কৃষির উন্নতি ও কৃষককুলকে কিছুটা রিলিফ দিতে এগিয়ে এসেছেন তারা, H. Y. V. বীজ বিতরণ করেছেন, কৃষিঋণ দিয়েছেন, মাঝেমধ্যে সার দিয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতির ওপর বাড়তি কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন, যা তাদের করতে হবে—

The West Bengal Essential Commodities Supply Corporation Ltd. কর্তৃক আগাম দেয় টাকায় সরাসরি চাষীর কাছ থেকে নগদ ধান, চাল কিনবেন এবং ফুড কর্পোরেশন গুদামে পৌঁছে দেবেন এবং ফুড কর্পোরেশন থেকে দাম পাবেন, পরে WBECSC-কে টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন কিংবা পাটের বেলায় গ্রামের পাটচাষীদের বিক্রয়যোগ্য নির্ধারিত পাট নিয়ে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হবেন, JCT র কর্মী ও কৃষি বিপণি

বিভাগের কর্মীরা থাকবেন, পঞ্চায়েতের কর্মীর উপস্থিতিতে পাটের মান নির্ধারণ ও ওজন করা হবে এবং চাষীকে নগদে মূল্য দিতে হবে।

ইত্যাদি উপরোক্ত কাজগুলি পঞ্চায়েত করেছে। কাজে সফলতা, ব্যর্থতার জন্য সীমাবদ্ধতা কোথায় (আর্থিক অসঙ্গতি অবশ্যই একটি অন্তরায়) বা আরেকটি প্রশ্ন যা নিয়ে অধিকাংশ গ্রামে ইদানীং কালে খুবই তোলপাড় হচ্ছে অর্থাৎ পঞ্চায়েত সদস্যদের সাধুতা নিয়ে—সে প্রশ্নেও আমি যাচ্ছি না। আপাতত দুটো প্রশ্ন নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক্—

(১) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও পঞ্চায়েতের ভিতরকার গণতন্ত্র

(২) তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ।

বিশেষ করে এ দুটো নিয়ে আলোচনা করার কারণ ওঁরা পঞ্চায়েতের কাজগুলোকে সংস্কারমূলক কাজের চেয়েও আরো এক ডিগ্রি বেশী বলতে চান, ঢাক পিটোন এই বলে যে তাঁরা নাকি সফলতার সাথে কাজদুটো করেছেন—আসুন একটু হিসেব মিলানো যাক।

প্রথমতঃ পঞ্চায়েতের গণতন্ত্র বা স্বাধীনতা কতটুকু? রাজ্য সরকার লিখিত আদেশ দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো প্রস্তাব প্রত্যাহার (rescind) করতে পারেন যদি তাদের অভিমতে তা পঞ্চায়েত আইন বা নিয়মপ্রদত্ত ক্ষমতার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ হয়েছে কিংবা প্রস্তাবটি জনসমষ্টির ক্ষতি বা বিরক্তির কারণ হতে পারে।

শুধু কি প্রস্তাব, রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়েতও বাতিল করে দিতে পারেন—

"যদি মনে করেন যে, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত (ক) পঞ্চায়েত আইন দ্বারা বা পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কিংবা অন্য কোনো আইন অনুযায়ী অর্পিত কর্তব্য পালনে অযোগ্যতা দেখিয়েছেন বা ক্রমাগত ত্রুটি দেখিয়েছেন অথবা (খ) তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতার অতিপ্রয়োগ বা অপব্যবহার করেছেন : তাহলে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে কারণ উল্লেখসহ আদেশ দিয়ে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত বাতিল করে দিতে পারেন।"

অবশ্য এও বলা আছে পঞ্চায়েতকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য জানাবার সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই সুযোগ কতোটা কার্যকর হয়, বিশেষ করে সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র যখন বিপরীতে—তা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। রাজ্য সরকার যদি মনে করেন তবে গ্রামীণ সাধারণ জনগণ

দ্বারা নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থা কি করুণ এবং অসহায়ই-না হয়ে পড়ে সুতরাং পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি ভালো ভালো বিশেষণগুলির কিই-না হাল হবে যদি মনে করার কাছিতে একটু টান পড়ে। তাদের কাছির টানে কত গণ আন্দোলন যে স্তব্ধ হয়েছে তারও উদাহরণ দিতে পারি যা আলোচনার কলেবর অযথা বাড়িয়ে তুলবে। আর রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হোলো গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্তব্যসমূহ (assighed duties) পালনে গাফিলতি লক্ষ্য করা গেলে, তারা ওই কাজের ভার প্রত্যাহার করে নেবেন।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি অর্থাৎ তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ, এই আলোচনায় প্রথমেই স্বীকার করছি তরুণ নেতৃত্বের জন্ম হয়েছে, এ ব্যাপারে হায়দ্রাবাদের এন. আই. আর. ডি তাদের সমীক্ষায় যে দুটো সিদ্ধান্ত টেনেছে (বামফ্রন্টও জোরগলায় এই কথাই বলেন) তা শোনা যাক (১) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন ভোট দাতাদের মধ্যে উচ্চ রাজনৈতিক বোধ, যার মধ্যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতপাতের বিচারের কোনো নামগন্ধ বা প্রভাব নেই। (২) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে শিক্ষিত যুব নেতৃত্বের সর্বপ্রথম উদ্ভব।

প্রথম সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি মানতে পারছি না। অবশ্যই গ্রামীণ জনগণের কিছুটা রাজনৈতিক বোধ কাজ করেছে—কিন্তু সেটা কতটা ধনাত্মক সেটাই বিচার্য, পঞ্চায়েত সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গ্রামীণ মানুষগুলোর ছিলো না, আর পূর্বের পঞ্চায়েত নামক অচলায়তন, পঙ্গু সংগঠনটির যেটুকু অভিজ্ঞতা ছিলো তা খুবই তিক্ত ও হতাশজনক, এমতাবস্থায় ১৯৭৮-এর নির্বাচন ও তদ্জনিত প্রচার ইত্যাদির ওপর তাদের মোহগ্রস্ত অবস্থাজনিত আশা তাদের মধ্যে এক নতুন উদ্যম আনে আর তারই প্রতিফলন পরে নির্বাচন ঘিরে গ্রামে গ্রামে—একে কি উচ্চ রাজনৈতিক বোধ বলব? আর পরের বার এ ব্যাপারগুলো খানিকটা লঘু হলেও, জনগণের ঋণাত্মক রাজনৈতিকবোধই কাজ করেছে বেশী।

আর গ্রামভিত্তিক তরুণ নেতৃত্বের উদ্ভব অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব কি সঠিকভাবে বিকশিত হলো? উত্তর নয়। কেন? তার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ তারা যে বিশেষ রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, সেই দলের রাজনৈতিক দেউলেপনা, কেননা পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে যে নেতৃত্ব উঠেছে, তারা অবশ্যই বৃহত্তর রাজনৈতিক

কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয় এবং তরুণ নেতৃত্বকে সঠিকভাবে রাজনৈতিক পরিচর্চা বা শিক্ষা দেওয়া হয়নি (সেরকম কোনো ইচ্ছাও ছিলো কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে), আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া ব্যতীত নেতৃত্বের আমদানীও হয়েছে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের নেওটা বা তাঁবেদার হিসেবে। কেবলমাত্র ভোটযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যে তরুণ নেতৃত্বের জন্ম হয়েছিলো, অতি স্বাভাবিক কারণেই তারা নষ্ট হয়ে গিয়েছে সংশোধনবাদী ও সোস্যাল ডেমোক্রাটদের ভ্রান্ত নীতির বলি হিসেবে। তাদের চরিত্রে ক্রমশঃ ভীড় করেছে ব্যক্তিবাদ (দাদা হওয়ার ইচ্ছে) অসাধুতা ইত্যাদি। এই অবক্ষয়ী সমাজে এই ঝোঁক আসাটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়, আর এটা কেবলমাত্র তখনই রোধ করা যেতে পারে যখন বৈপ্লবিক কর্মসূচীর দৈনন্দিনতায় উক্ত তরুণেরা আবদ্ধ থাকে।

যদিও অশোক মেহেতার কমিটির সিদ্ধান্ত হোলো—"মানবিক সম্পদের উন্নয়ন পঞ্চায়েতীরাজের গোড়ার কথা। জাগ্রত গণচেতনা ও গণ সমর্থন এই সংগঠনগুলির পাথেয়, তাই এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতী সংগঠনগুলিকে নতুন মানসিকতায় দীক্ষিত করে তুলতে হবে। পঞ্চায়েতীরাজ সংগঠনের নেতৃস্থানীয় সকল অধিকারী, সকল স্তরের কর্মী সংগঠনকে তাদের নিজ দায়দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।" এই দায়িত্ববোধ ও সাধারণ মানুষগুলোকে নিয়ে ভাবার অভ্যেস ইত্যাদির অভাব তরুণ নেতৃত্বের মধ্যে যথেষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর তার ফলেই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ব্যাপারটাও এমন হয়েছে, যেটা হওয়া উচিত ছিলো সাংগঠনিক সেটা হয়েছে ব্যক্তিগত—হওয়া উচিত ছিলো অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পঞ্চায়েত নামক সংগঠন, তা না হয়ে তৈরী হয়েছে ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু আঞ্চলিক 'দাদা'।

আরেকটি মারাত্মক ব্যাপার ঘটছে তা হোলো সাধারণ জনগণের নির্বাচিত সংগঠনটি দিন দিন শিকার হয়ে পড়ছে আমলাতন্ত্রের, যা কিনা সংসদীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে ক্ষতিকারক সর্বনেশে ঝোঁক। নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এবং তার পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে সামগ্রিক কাঠামো তৈরী করে, যাতে কিনা এ বিপদ আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হোলেও উক্ত ব্যাপারটা বোঝবার সুবিধায় ৪০ পৃষ্ঠায়

ছকটা দেওয়া হোলো, যাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে সমান্তরালভাবে একই সাথে দুটো ব্যবস্থা কিভাবে কার্যকর হচ্ছে।

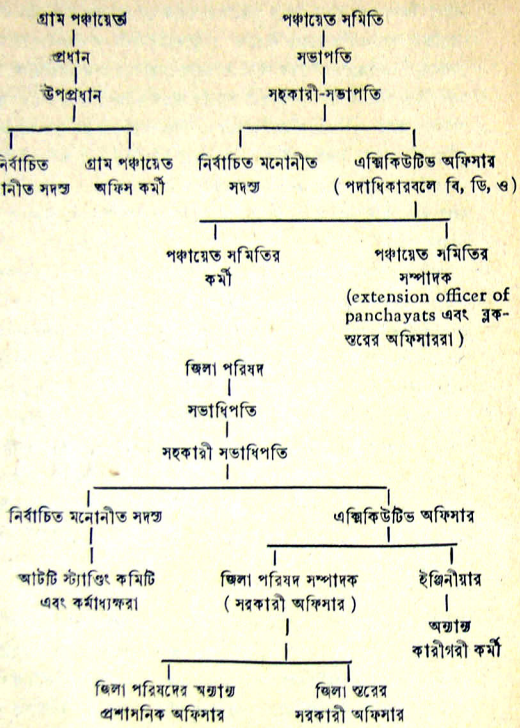

এই অবস্থায় নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত আমলাতন্ত্রের ওপর যে কতটা নির্ভরশীল ও আমলাতন্ত্রের শিকার হবার যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তা পরিষ্কার ধারণা করা যেতে পারে উপরের ছকটির বিশ্লেষণ করলে এবং তা হয়েছেও পদে পদে আর তাই বুঝি অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র (ভুল করেই হয়তো বা!) আত্মসমালোচনা করে ফেলেন—"প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন কাঠামোর নাম পরিচয় ও অন্যান্য ফরমাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলা যায় না। গণমুখী প্রশাসন নিত্যসঙ্গী রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা। এই স্বচ্ছতার অভাবে কাঠামোর আপাত পরিবর্তন গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কের মূলগত কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। হয়তো প্রতিষ্ঠিত সরকারী আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তে আর এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠিত হবে। আর তেমন কোনো পরিণতি পঞ্চায়েতগুলির পক্ষে হবে একান্ত ভয়াবহ।"

পঞ্চায়েত আরেকটি কাজ সুষ্ঠুভাবে ফলপ্রসূ করার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে, তা হোলো অপারেশন বর্গা যা নিয়ে বামফ্রন্ট আমলে তুমুল হৈ চৈ চলেছে এবং তাঁরাও বলতে চেয়েছেন উক্ত কাজটি নাকি তাদের মৌলিক সৃষ্টি এবং একটি বৈপ্লবিক কাজও বটে। আসুন 'অপারেশান বর্গা' নিয়ে আলোচনা করি, খতিয়ে দেখি কতটা বিপ্লব লুকিয়ে আছে।

বর্গাদারের ইতিবৃত্ত, অপারেশন বর্গা কতটা জরুরী—আলোচনার সুবিধার জন্য খুব সংক্ষেপে একটু অতীতে যাই, বিভিন্ন সময়ে বর্গাদারকে ঘিরে যে সমস্ত আইন এসেছে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করি। যতদূর মনে পড়ছে প্রথম আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয় ১৯৫০ বর্গাদার এ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে, তাতে বলা হয় ইচ্ছে করলেই বর্গাদার উচ্ছেদ চলবে না। কেবলমাত্র তখনই করা যাবে যদি বর্গাদার দোষী হয় কিংবা জমির সদ্ব্যবহার না করে। ফসলের ভাগ হবে তাদের চুক্তি অনুযায়ী, তা যদি না থাকে তবে তিন ভাগের এক ভাগ করে উভয়ে পাবে এবং বাকী ৪ ভাগ বণ্টন হবে উক্ত ফসল উৎপন্ন করার ব্যাপারে কার কতটা ব্যয় হয়েছে সেই অনুযায়ী। তারপর১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনে বলা হয়েছিলো ৬০ শতাংশ ফসল পাবে বর্গাদার যদি সে শ্রম এবং ফসল উৎপন্ন করতে প্রয়োজনীয় রসদ উভয়ই দেয়। কিন্তু আমরা দেখেছিলাম উক্ত আইন সত্ত্বেও ফসল বণ্টনের রীতি চলে আসছিলো চিরায়ত মতে, বর্গাদার অর্ধেকের বেশী কোনো সময়ই পায়নি।

আর বর্গাদার উচ্ছেদ ক্রমশঃ বেড়েইছে, কমেনি। নিজে চাষ করার অজুহাতে বর্গাদার উচ্ছেদ নিত্যকার ঘটনা ছিলো এবং তা রোধ করার মত আইন তখনও হয়নি। ১৯৭১ সালে '৫৫ আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন শাসকেরা করেন, সম্ভবত তাদের স্মরণে ছিলো—যুক্তফ্রন্ট আমল, খাসজমি উদ্ধার, সত্তর দশকে নক্সালবাড়ী কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় যে কৃষক আন্দোলন চলেছিলো ইত্যাদি ব্যাপারগুলো। সংশোধনগুলি করে শাসককুল প্রগতিশীলতার মুখোশ পরতে চেয়েছিলো, এতে বলা হয়েছিলো—বর্গাদার ৭৫শতাংশ ফসল পাবে যদি সে শ্রম রসদ উভয়ই দেয়, শুধু শ্রম দিলে পাবে ৫০ শতাংশ। ১ হেক্টরের বেশী জমি থাকলে বর্গাদার নিযুক্ত করা যাবে এবং একজন বর্গাদারের আওতায় কোন সময়ই ৬ হেক্টরের বেশী জমি থাকবে না। জমির মলিক নিজে চাষ করতে ইচ্ছুক হোলে সর্বাধিক ৩ হেক্টর জমিতে চাষ করতে পারবে তবে বর্গাদারের জন্য ন্যূনতম ১ হেক্টর চাষযোগ্য জমি রাখতে হবে। বর্গাদারের ছেলেও এই জমির বর্গাদার হবে, জমির মালিককে ফসল বুঝে পাবার পর প্রমাণপত্র দিতে হবে। যদি কোনো সময় বর্গাদার মালিককে জমি ফেরত দিতে ইচ্ছুক হয় তবে তা হবে সরকারী অফিসারের উপস্থিতিতে এবং বর্গাদার উচ্ছেদ করা তখনই যাবে যদি বর্গাদার ঠিকমতো চাষ না করে, জমি ফেলে রাখে, অন্যকে দিয়ে চাষ করায় বা মালিককে তার ফসলের ভাগ বুঝিয়ে না দেয়।

খাতায় কলমে সংশোধনগুলো যতটা প্রগতিশীল হোক না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি, বর্গাদার উচ্ছেদ ঘটেছে অবাধগতিতে, কৃষি শ্রমিক বেড়েছে হুড়হুড়ু করে। আইন বা পুলিশের তরফ থেকে কোনো সাহায্যই বর্গাদারেরা পায়নি, প্রতিবাদ করলে পোরা হয়েছে জেলে।

এমতাবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার আসে, যেহেতু তারা গরীবের সরকার (অন্ততঃ তারা তাই বলেন) সুতরাং গ্রামের সাধারণ মানুষকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেই হবে—ভাবতে বসেন তাঁরা। ভূমিসংস্কার আইনগুলোকে সঠিক রূপায়ন করতে গিয়ে সবচেয়ে জরুরী হয়ে পড়েছিলো দখলদার হিসেবে বর্গাদারকে প্রমাণিত করা, এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য নিতে হোলো আইনের। বর্গাদারকে অস্বীকার করতে হোলে জমির মালিককে প্রমাণ করতে হবে যে, তার পরিবারের সদস্য নয় অথচ জমি চাষ করে কিন্তু ওই জমির ওপর তার (বর্গাদারের) কোন দখলস্বত্ব নেই।

আর '৭১ সংশোধনীতে বলা হয়েছিলো জমির মালিক ফসল বুঝে পেলে বর্গাদারকে প্রমাণপত্র দেবে যাতে জমির নং ইত্যাদি থাকবে, পরবর্তী ক্ষেত্রে ওটাই হবে একমাত্র মূল্যবান প্রমাণ বর্গাদারের স্বত্ব প্রমাণে। বর্তমানে আরও একটু সংশোধন করে বলা হয়েছে যদি প্রমাণিত হয় জমির মালিক উক্ত প্রমাণ পত্র বর্গাদারকে দেয়নি তবে তার ৬ মাসের জেল বা ১০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে। আর যে কাজটি সবচেয়ে জরুরী, তা হোলো অপারেশন বর্গা—সময় সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া, সেটেলমেণ্ট ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বর্গাদারের জমি রেকর্ড করা, এই কাজের প্রথম পর্ব হোলো কোনো বর্গাদার যে সেই জমিতেই চাষ করে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা এবং এই কমিটি করবার জন্যই ডাক পড়ে পঞ্চায়েতের। গ্রাম পঞ্চায়েত তার এলাকার বর্গাদারকে চিহ্নিত করবে, সরকার থেকে উক্ত বর্গাদারকে 'পরচা' দেওয়া যা-কিনা তার বর্গাদারীর প্রমাণপত্র।

আর জমির মালিক ব্যক্তিগতভাবে চাষ করার জন্য বর্গাদারের হাত থেকে জমি তখনই নিতে পারবে যদি সে প্রমাণ করতে পারে তার পরিবারের অধিকাংশই উক্ত জমির লাগোয়া বাস করে এবং কেবলমাত্র জমির আয়ের উপর পরিবার নির্ভরশীল।

এতো গেলো আইন দিয়ে বর্গাদারের নিরাপত্তা আনবার প্রয়াস। এ কাজে জোয়ার আসলো হাঁকডাক দিয়ে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত ১'৩ লক্ষ বর্গাদারকে রেকর্ডভুক্ত করা হোলো, কিন্তু 'বিপ্লব' কতদূর হোলো!

বামফ্রন্ট সরকার এই সংস্কারমূলক কাজের (বৈপ্লবিক নয়) মধ্য দিয়ে সমস্ত কৃষককুলের একটা অংশের আংশিক নিরাপত্তা এনেছে ঠিকই, এখন আর ইচ্ছে করলে রেকর্ডভুক্ত বর্গাদার উচ্ছেদ করা যাবে না—মানলাম এসব কথা, কিন্তু এই কাজে কতটা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হোলো কিংবা তাদের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যের (long term odjective, যেমন বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক সি, পি, আই (এম)-এর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব) দিকে কতোটা এগোলো?

অপারেশন বর্গাকে সঠিক রূপায়ন করতে তাদের সবসময় নির্ভর করতে হচ্ছে দুটোর ওপর—(১) আইন ব্যবস্থা (২) আমলাতান্ত্রিক কাঠামো।

উক্ত ব্যবস্থাদ্বয়কে হাড়ে হাড়ে আমরা জানি, বা ওঁরাও দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশের কথা বলতে গেলে উভয়ের বিরুদ্ধে বলে ফেলেন। কেননা এই

শাসন ব্যবস্থায় আইন ব্যবস্থা ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামো উভয়েই একে অপরের পরিপূরক হয়ে বুর্জোয়া, জমিদার, জোতদারদের পক্ষপাতিত্ব করে ও তারা কোনো সময়ই সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে না, করতে পারে না। কিন্তু গরীব মানুষের সরকারের কেন এই নির্ভরশীলতা এদের ওপর, বুর্জোয়া কাঠামোর ওপর—কিংবা বিচ্ছিন্ন একটি বা দুটি রাজ্যে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মৌলিক কৃষি সম্পর্কের উপর আঘাত আনা যায় কি? নিশ্চয়ই যায় না, তাই অপারেশন বর্গাজনিত অগুনতি মামলা ফাইলবন্দী হয়ে আছে কোর্টে। এই সামান্য সংস্কারগুলো করতে কতোই না অন্তরায় এসেছে, তবু সংশোধনবাদী দলগুলি সেখানে আছেন—পার্লামেন্ট ব্যবহারের লেনিনীয় চিন্তাধারার অপব্যবহার করছেন। Long term objective-এর কথা ভুলে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে ফেলেছেন এঁরা এই অপারেশন বর্গা করতে বসেও। কিভাবে করছেন? তার কতকগুলো দিক এখানে আলোচনা করছি।

একটা প্রশ্ন প্রথমেই মাথায় আসে, বামফ্রন্টের নেয়া কর্মসূচীগুলো আপাতভাবে সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যেই হয়েছে বলে প্রতিভাত হবে, কিন্তু বুর্জোয়া জোতদারদের উপর কোন আঘাত কি আনতে পেরেছে বা তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথার কারণ হয়েছে কি বামফ্রন্ট সরকার? নিশ্চয়ই নয়, তা যদি হোতো রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রকেরা অবশ্যই ভাবতে বসতেন এ রাজ্যের ক্ষমতায় তাদের আর রাখবেন কিনা, কিন্তু তারা তা করেননি। কেননা তারাও খুব ভালোমতো জানেন ও বোঝেন গণ আন্দোলনের রাজ্য এই পশ্চিম বাংলায় এ ধরনের সংশোধনবাদী [সি-পি-আই (এম)-এর কর্মসূচী বিশ্লেষণে এই সংজ্ঞাটা মানানসই কিন্তু রাজ্য সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন, অন্যতম শরিক হিসাবে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা বলবো তারা হচ্ছে সোস্যাল ডেমোক্রাট]-দের দিয়েই রাজ্য চালানো সবচেয়ে সমীচীন কেননা সাধারণ মানুষ এদের চরিত্র বুঝতে একটু সময় নেবে এবং ততক্ষণে তারা প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। 'অপারেশন বর্গা'কেও আমরা সেই নিরিখে বিচার করবো। অপারেশন বর্গাকে জোতদার শ্রেণী তেমন প্রচণ্ড বিরোধিতা করেনি কেননা তারা দেখেছিলো উক্ত কর্মকাণ্ডটি তাদের কাছে ক্ষতিহীন ক্ষতি। আর অপারেশন বর্গার আওতায় পড়েছে বৃহৎ জোতদারদের চেয়ে অনেক বেশী মধ্যচাষী এবং ছোট জমি-মালিকেরা। আর একটি অংশের জমিও রেকর্ডভুক্ত করা

হয়েছে তারা অকৃষক চাষী [ছোটো বা মধ্যচাষীরা ক্ষেতমজুর, কৃষি-শ্রমিক হওয়ার কালে তাদের জমির একটা বড়ো অংশ চলে যায় এই শ্রেণীর হাতে, এরা কোনোদিন কৃষি কাজের সাথে যুক্ত ছিলো না—গ্রামীণ মধ্যবিত্ত চাকুরে, দোকানদার এই সংজ্ঞাভুক্ত হচ্ছে]। সুতরাং 'অপারেশন বর্গার ফলে বর্গাদারদের নিরাপত্তা এলো ঠিকই কিন্তু উপরোক্ত শ্রেণীর অনিচ্ছুক বাধ্যতা এমন এক পর্যায়ে গেলো যাতে কিনা তারা বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে তিক্ত হয়ে উঠলো—যে অংশটি এতোদিন ছিলো তাদের আন্দোলনের শরিক, গ্রামীণ জনগণের কাছে স্তুতি গাইবার মাধ্যম, Long term objective সফল করতে অপরিহার্য অংশ। বড় মাছ রইলো জলের গভীরে, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আর মিত্র ছোটো মাছ ধরা পড়লো জালে।

এটা আমাদের কাছে জ্ঞাত যে 'অপারেশন বর্গা' নামক ব্যবস্থাটি একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে উক্ত ব্যবস্থা ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময়েই ব্যবস্থাটাকে আঁকড়ে ধরা হয়, ফলে হয় একটা অপূরণীয় ক্ষতি যা অনেকের নজরে আসার সম্ভাবনা খুব কম; তা হলো ইতিমধ্যে কৃষি শ্রমিক, ভূমিদাসের সংখ্যা বেহিসেবে বেড়ে চলেছে গ্রামে গ্রামান্তরে তখনই উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্রতর অংশের নিরাপত্তা, ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছে বৃহত্তর কৃষি-শ্রমিক অংশের সাথে বর্গাদারের, এতোদিন সবাই তারা ছিলো আপনার জন, ঘরের লোক কিন্তু অপারেশন বর্গা তাদের সৌহার্দ্যের মধ্যে চিড় ধরিয়েছে এবং তা হয়েছে মানবিক স্বার্থ সম্বন্ধযুক্ত কারণেই। বৃহত্তর অংশ [কৃষি শ্রমিক, ক্ষেতমজুর] স্বগতঃই বলে ফেলছে 'যাও, যাও—তোমাদের আর কি চিন্তা। তোমরা আধপেটা খেয়েও বেঁচে থাকবে, কুলীন হোলে যে আজকাল আর আমাদের...'

সংশোধনবাদীরা জ্ঞাতসারে [হয়তো বা অজ্ঞাতসারে?] এ ধরনের সংস্কারমূলক কাজ করতে বসে অপূরণীয় কিছু ভুল করে ফেলে, বহু উপ-শ্রেণীর সৃষ্টি করে যাতে বিপ্লব যায় বহুদূরে পিছিয়ে, আখেরে তাদের হয় আপাত লাভ, প্রকৃত লাভ হয় বুর্জোয়া-জমিদার-জোতদার শ্রেণীর। এবার খোলা চোখে কিছু দেখি; 'অপারেশন বর্গা" ঘিরে দলবাজী হচ্ছে চূড়ান্ত। এখনকার দ্বন্দ্ব আর বর্গাদার, জমি মালিকের মধ্যে নয়, দ্বন্দ্ব এখন এক পার্টির সাথে অপর পার্টির। বর্গাদার জমি মালিক উভয় শ্রেণী সে

তো কংগ্রেসে সি-পি-আই (এম)-এ উভয় অংশেই আছে [কূট তার্কিকে বলবে শেষোক্ত দলে বর্গাদারের সংখ্যাই বেশি ইত্যাদি] । এমনকি এই দলবাজীর ঢেউ আছড়ে পড়েছে বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকদের মধ্যেও। এ ধরনের সমস্যাগুলির মীমাংসা করতে গিয়ে পঞ্চায়েত হয়ে যাচ্ছে পুতুল। প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাবে বর্গাদারের দাবী অনেক অংশেই ধোপে টিঁকছে না আর আমলা-তান্ত্রিক গাফিলতির খেসারত তো আছে পুরো মাত্রায়, আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল বামফ্রন্ট সরকার যথা সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে সম্পূর্ণ অক্ষম। সি-পি-এম-এর তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী বিপ্লব দাশগুপ্ত 'অপারেশন বর্গা'কে যুগান্তকারী প্রমাণ করতে বসেও বলে ফেলেন 'In several case the recording was not properly done because of administrative lapses.'

এবার আমরা আলোচনার শেষ পর্বে চলে আসি, এ ধরনের সংস্কার-মূলক কাজের মধ্য দিয়ে যখন মূল সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না এমনকি এ ধরনের সংস্কারগুলো কেবলমাত্র মায়াজাল সৃষ্টি করে প্রকৃত আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তখন আমাদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কী হওয়া উচিত।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, কর্তব্যই বা কী—এ পর্যায়ে আমরা আবার একটু সমগ্র [অর্থাৎ ভারতবর্ষ] নিয়ে আলোচনা করবো যার একটা অংশ হচ্ছে পশ্চিম বাংলা, বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল নয় আর বামফ্রন্ট সরকার এখানে আসীন থাকাও একটা সংস্কারমূলক ঘটনা ব্যতীত কিছুই নয়। সামন্ততন্ত্রের সাথে পুঁজিপতি, মিল মালিকেরা আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যার ফলে বিচ্ছিন্নভাবে সামন্ততন্ত্রকে দেখাটা অমূলক হয়ে পড়ছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই এ গলাগলি শুরু হয়ে যায়, উভয়ের স্বার্থই একইভাবে ওঠানামা করতে থাকে, প্রতিফলন এসে পড়ে জাতীয় নেতৃত্বে এবং তাদের নেওয়া কর্মসূচীতে। বহু বড়ো বড়ো কৃষিফার্ম আজ বর্তমান যার মালিক পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে টাটা-বিড়লা বা ইত্যাদি পরিবারেরা। আর বিভিন্ন সময়ে যে সংস্কারগুলো করা হয়েছে তা কেবল মাত্র বাম আন্দোলনকে বন্ধ করতে অর্থাৎ এমন এক পরিবেশ তৈরী করা যাতে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির ওপর সাধারণ মানুষ আস্থাশীল হয়ে পড়ে এবং মূল আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। সরকারের দেয়া ডাক

সবুজ বিপ্লব কিংবা বিভিন্ন কর্মসূচী—জমিদারী প্রথা বিলোপ, গরীবী হটাও ইত্যাদিতে একই সুর বা ইচ্ছে অনুরণিত হয়েছে। ধরুন না, জমিদারী প্রথা বিলোপ করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রগতিশীল সাজতে চাইলেন এমন কি এদেশের বাম পার্টি'রাও উক্ত কাজের স্তবে সরব হয়ে উঠলেন কিন্তু আমরা কি দেখলাম—

These measures (zamindary abolition) can hardly be said to have produced a radical change in property relations. For the former intermediaries, abolition meant merely a change in the sources of their income and particularly for those with a large income—some reduction in size ['Asian Drama'—Gunnar Myrdal]

এই কর্মসূচীর ফলে কেবলমাত্র দালাল শ্রেণীর উচ্ছেদ হয়েছে, জমিদারের গায়ে আঁচড়টি পরেনি। তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বর্গাদার, ছোট চাষীরা কেননা এই প্রথা বিলোপের সাথে সাথে জমিদারেরা বিশাল আয়তনের জমি 'ব্যক্তি জমি' হিসেবে এক্তিয়ার ভুক্ত করেছে। বিভিন্ন সময়ে যে ভূমিসংস্কার হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হোলো মধ্যযুগীয় অনুন্নত সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক নতুন রীতি প্রবর্তন যেখানে জোতের ঘনত্ব ভাঙচুর করে এমন এক অবস্থায় নেওয়া যেখানে অনেক বেশী মাত্রায় কৃষিশ্রম নিয়োজিত করিয়ে উৎপন্ন ফসলের মাত্রা বাড়ানো, সামন্ততন্ত্রের পরিবর্তে বুর্জোয়া ধরনের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করা সহজ।

'সবুজ বিপ্লব'—তাতেও সেই একই সুর বেজেছে যার মূল বক্তব্য হোলো বেশী বেশী চাষ, প্রযুক্তিবিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কৃষির উন্নতি, বেশী মাত্রায় ফসল উৎপন্ন—কিন্তু এই কর্মসূচীতে কৃষক ছিলো এমন এক শূন্যস্থানে যার সাথে কোন সংস্রবই ছিলো না উক্ত বিপ্লবের। আমূল ভূমি-সংস্কার, খাস জমির উদ্ধার, জমি বণ্টন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ছিলো অনুপস্থিত, ফলে কৃষির আপাত আয় বাড়িয়ে বুর্জোয়া জোতদারদের থলি ভর্তি হোলো ঠিকই কিন্তু কৃষি শোষণ বাড়লো মাত্রাতিরিক্তভাবে। এ ধরনের সবুজ বিপ্লবে কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর কৃষকেরাই লাভবান হোলো যারা বৃহত্তর বাণিজ্যিক বাজারে পাল্লা দিতে সক্ষম। ছোটো চাষীর অবলুপ্তি এবং বর্গাদারের উচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠলো—কৃষি-শ্রমিক, ভূমিদাসের সংখ্যা বাড়লো গুণোত্তর গতিতে।

সংগঠিত হোলো কৃষক বিদ্রোহ, ভূমিদাসদের আন্দোলন—সবুজ বিপ্লবের আহ্বায়কদের চোখের ঘুম গেলো উবে—উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, এই বুঝি সবুজ বিপ্লব 'রাঙা' হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যের সাথে এটাও লক্ষ্য করা গ্যাছে ওই সকল আন্দোলনের প্রতি তৎকালীন বাম নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, সংশোধনবাদী ঝোঁক।

আসল ব্যাপার হোলো এ যাবৎকাল যে সমস্ত কথাবার্তা বলা হয়েছে বা ভাবনা চিন্তা করা হয়েছে তার সবই হোলো কৃষিতে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রয়াস। এই অবস্থায় কম্যুনিষ্ট পার্টির আশু কর্তব্য হোলো সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ব্যবস্থার উচ্ছেদ করবার চেষ্টা চালানো কেননা এই উত্তরণের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়বার সাথে সাথে শোষণের চরিত্র হয়ে পড়ে কারখানার শ্রমিকের মতো—কৃষি শ্রমিকের ক্রমশঃ প্রোলেতারীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া কৃষি সম্পর্কিত সকল কর্মসূচী এবং এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত, অপারেশন বর্গা ইত্যাদি সংস্কারমূলক কাজ চারিত্রিক দিক থেকে একই ধারা বেয়ে চলেছে ; লেনিন যাকে বলেছেন, 'Land lord bourgeoise revolution।' দুঃখজনক এখানেই, যখন এ রাজ্যে বামসরকার কিছুটা রিলিফ দিতে এসে, সংসদীয় ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করতে বসে কেবলমাত্র উপরোক্ত কাজগুলোতে মনোনিবেশ করে ফেলে, শিকার হয়ে যায় সংসদীয় ব্যবস্থার, ভুলে যায় 'Long term objective'-এর কথা। আর তখনই বিপদটা হয় সবচেয়ে বেশী। সাধারণ মানুষ প্রকৃত আন্দোলন থেকে বিপথগামী হয়, হতাশাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা এসে পড়ে তাদের। কখনো সখনো বা তারা যে কিছু মৌলিক কাজ করেনি তা নয় কিন্তু সবই হোলো সংসদীয় ব্যবস্থাকে মাথায় রেখে এবং এ-কাজ করতে গিয়ে বুর্জোয়াদের সাথে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে তা নিতান্তই অবৈরীমূলক (Non-antagonistic)। এ ধরনের কাজগুলোকে তাহলে আমরা কি নজরে দেখবো ? তা হোলো '……adopted solely to the interest of the land lords……' এবং মার্ক্সবাদীরা সর্বদা এর বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত থেকে বৈরীমূলক (Antagonistic) বৈপ্লবিক লড়াই চালাবে, কোন সময়েই যেন সংস্কারমূলক কাজকে 'বৈপ্লবিক' না ভেবে ফ্যালে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে মৌলিক কৃষিসংস্কার তখনই সম্ভব যখন রাজনৈতিক বিপ্লব সমাধা হবে, গণ-অভ্যুত্থানের ভিতর

দিয়ে বিপ্লবীরা রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হবে।

এ প্রসঙ্গে লেনিনের উক্তি টানছি—"কৃষকেরা কৃষিবিপ্লব সমাধা করতে পারবে না যতোদিন না তারা পুরানো ব্যবস্থা, বর্তমান সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র নিশ্চিহ্ন করছে, কেননা এগুলোই হচ্ছে হাজারো বন্ধনে বাঁধা জমিদারী ব্যবস্থার বিশ্বস্ত অবলম্বন।…"

"…বলার অপেক্ষা রাখে না একটি পূর্ণ রাজনৈতিক বিপ্লব কঠিন কাজ, আর কৃষি বিপ্লব—সেটাও ঠিক তাই। শেষেরটি কোনো সময়েই প্রথমটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং একজন সমাজতন্ত্রীর অবশ্য দায়িত্ব হোলো উক্ত ব্যাপার গোপন না করে, আবরণ না টেনে খোলাখুলি বলা, কৃষকদের এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা সমগ্র রাজনীতিটা ধরতে পারে, যদি তা না হয় তবে জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ নিয়ে ভাবনা চিন্তা অমূলক হয়ে পড়বে।"

আগামী সংখ্যায় পথিক বসুর প্রবন্ধ □ দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প এবং সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'মহারাজা দীর্ঘজীবি হোন' আলোচনা করবেন **অতনু সরকার** □

চিঠিপত্র

সম্পাদক সমীপেষু
অন্বর্থ

প্রিয় সম্পাদক মশাই,

আপনারা একটি পত্রিকা বার করেছেন, যার গোড়াতে দ্বন্দ্ববাদের প্রতি আপনাদের অঙ্গীকার ও শেষে মাও-ৎসে-তুং-এর বিপ্লবী সাহিত্য সম্পর্কিত একটি উদ্ধৃতি রয়েছে। উচ্চকণ্ঠে এই ঘোষণাগুলির পরিপূরক কিছু লেখাও আপনাদের পত্রিকাটিতে রয়েছে, যা থেকে এমন ধারণা করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে সামাজিক লড়াইতে আপনারা সরাসরি পক্ষাবলম্বন করতে চান এবং পত্রিকাটির একটি চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও আপনারা সাধ্যমতো যত্নবান থাকতে চান। আপনাদের পত্রিকার একজন আগ্রহী পাঠক হিসাবে এই চেষ্টার সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করছি।

অতঃপর যে জন্য এই চিঠি। এইরকম একটি পত্রিকায় প্রায় আলটপকা একটি লেখা আপনারা ছাপিয়ে ফেলেন, যে লেখা আপনাদের যাবতীয় অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতা ও বোধ-বিবেচনা সম্পর্কে আমাকে বিচ্ছিরি রকম ধাঁধায় ফেলে দেয়। যে সহমর্মিতার কথা আগেই বলেছি, সেখান থেকেই লেখাটিকে খানিক বুঝবার চেষ্টা, কিছু প্রশ্ন। বলবার ধরণটা যদি একটু বেশী বাঁকা-চোরা ঠেকে লেখক ও সম্পাদক মশাই দয়াশীল হবেন আশা করি।

যে লেখাটি সম্পর্কে বলছিলাম। পথিক বসু-র "রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-ধর্মী নিবন্ধ"—এক জন্মের কথা। এমনটি আশা করা যায়, হয় নিবন্ধটি রাজনৈতিক, নয় বিশ্লেষণধর্মী হবে, অর্থাৎ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোকিছুকে বিশ্লেষিত করবে বা বিশ্লেষণ করবে রাজনীতিকে। কিন্তু কিমাশ্চর্যম। নিবন্ধটিতে রাজনীতি বলতে বার কয়েক মার্কসবাদ ও মার্কস-বাদী ও চিন্তানায়কদের উল্লেখ। বিশ্লেষণ বলতে প্রচুর ইংরাজী কোটেশন, কবিতার পংক্তি, মাথামুণ্ডুহীন অস্বচ্ছ খানিক বাক্‌সর্বস্বতা। সেন্সরশিপ

না-হয় নাই থাকলো, তার সুযোগে লোকের ওপর এমন অত্যাচার! এমনকি গণতন্ত্রের অপব্যবহারও বলা যায়।

আলোচ্য লেখাটির প্রয়োজন কি? কি বলতে চাওয়া হয়েছে লেখাটির মধ্য দিয়ে? যা বলতে চাওয়া হয়েছে কিভাবে তা বলা হয়েছে? এই সব প্রশ্নগুলি প্রায় অশালীনভাবে খোঁচাতে থাকে।

প্রথমতঃ, আমি যা বুঝেছি সেইমতো, লেখাটি শুরু হয়েছিলো, যে কোনো শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের অপরিহার্যতার ক্রম সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার কথা বলে। বিষয়টি নন্দনতত্ত্বের, বিশেষতঃ মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের, যার সম্পর্কে চূড়ান্ত ও অনিবার্য সিদ্ধান্তে আদৌ এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছোনো যায়নি। মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের ধারণা বহুবিধ: যার ভিতরে লুনাচারস্কির সামাজিক শিল্প, ব্রেশটীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে শুরু করে লুকাচের ঐতিহাসিক-নান্দনিকতা ইত্যাদি নানান চিন্তাসমূহ ঢুকে আছে। সে সবের ঝামেলায় না গিয়ে লেখক গাল পেড়েছেন লেনিনকে, একটি বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের একটি বিশেষ উক্তি উদ্ধৃত করে এমনটি বলেছেন যেন ওইটি শিল্পসম্পর্কিত মার্কসবাদী ধারণার সারসংকলন। লেখকের কি জানা আছে এই লেনিনই মায়াকভস্কির চেয়ে বেশী পছন্দ করতেন পুশকিনকে?

যাক সে কথা। অতঃপর লেখক দড়াম করে PRAXIS বিষয়ে নানান কথা বলার চেষ্টা করেন এবং যে বিষয়ে লেখা শুরু করেছিলেন তাকে সুন্দর-ভাবে ভুলে যান। তিনি জ্ঞানতত্ত্বে ডুবে যান এবং লেনিনকে আবার গাল পাড়তে থাকেন। কিভাবে গাল পাড়েন? প্রায় শুটকী শুয়োরের মাংস হয়ে গেছে এইরকম ভাববাদী গ্যাঁজানি আমদানি করে। ভুল বললাম। লেখক ভাববাদটাও ভালো বোঝেন না। সংবেদন এবং জ্ঞান সম্পর্কে ভাববাদী ধারণা বিষয়ে লেখকের জ্ঞান: "আমার চেতনার রঙে পান্না হোলো সবুজ' ইত্যাদি। লেখক কি এ জানেন না যে বস্তু-সংবেদন-জ্ঞান-বস্তু—এটি হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, এদের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর বস্তুবাদীরা স্বীকার করেন না? সেখানে যাবতীয় ভাববাদীরা বিষয়ীর (subject) মধ্যে দেখেন অপার্থিব কোনো চেতনার উদ্ভাস, এবং তাঁকেই তারা সত্য বা সত্যলাভের উপায় বলে ধরে নেন?

লেনিনীয় বস্তুবাদের কোথায় আছে সংবেদন মানে প্রতিবিম্ব? বরং

লেনিনীয় ধারণা কি এটাই নয় যে সংবেদন হচ্ছে বস্তুর নিয়ন্ত্রক নির্ধারক চরিত্রগুলি সম্পর্কে বিষয়ীর সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় (object) ও বিষয়ীর মধ্যে একটি অবশ্যম্ভাবী সেতুবন্ধ? সংবেদন মানেই প্রতিবিম্ব? Materialism and Empirio-criticismটা লেখক আরেকবার পড়ুন। তার সঙ্গে Philosophical Note-Booktটাও। ওই বইটি না পড়ে লেনিনীয় বস্তুবাদ সম্পর্কে কথা বলাটা স্রেফ উদ্ধত বাতুলতা।

এরপর লেখক হেগেল, সার্ত্র ইত্যাদির নাম করেছেন। আমার ছোটো বুদ্ধিতে এর অর্থ বুঝতে পারিনি।

যাই হোক, লেখক এবার লেনিনকে ছেড়ে মার্কসবাদে ব্যাপৃত হন। এঙ্গেলস সম্পর্কে লেখক যে অভিযোগ করেছেন, সেটি তিনি ধার করেছেন বিনয় ঘোষ থেকে এবং তিনি জানেন কিনা জানি না বিনয় ঘোষ সেটি ধার করেছেন মার্কিউস ইত্যাদিদের লেখা থেকে। মার্কসবাদ সম্পর্কে এতোবড়ো গুরুতর অভিযোগ করছেন, এঙ্গেলসকে গাল দিচ্ছেন, মার্কসবাদ নাকি প্রাণহীন, হৃদয়হীন অর্থনীতি, এঙ্গেলস নাকি মার্কসবাদের বিকৃতি-সাধক—আর এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলবেন বিনয় ঘোষ ওরফে মার্কিউস সাহেব? আপনার কিছু বলার আছে? কিছু আদৌ আছে কি?

আছে। অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কিছু উদ্ধৃতি এবং সমাজ এবং ব্যক্তি-মানুষের দ্বন্দ্ব বিষয়ে কিছু কথা। তার মূল প্রতিপাদ্য কি? মার্কসের উদ্ধৃতিটিতে স্টালিনের বক্তব্যটি খণ্ডিত হয় না, বরং তা বিশ্লেষিত হয়। স্টালিন যা বলেছেন, যে কোনো বস্তুবাদীই তাই-ই বলেন। ১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক পাণ্ডুলিপিতে মার্কস যা বলেছেন তা তাঁর গোটা জীবনের চিন্তা-ভাবনার সাথে সংগতিপূর্ণ, আর আজ আমরা সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে বাধ্য। সম্প্রতি মেসজারোস সাহেব মার্কসবাদ ও বিচ্ছিন্নতা নিয়ে একটি বইতে এ বিষয়ে বড়ো চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। হে লেখক, সময় থাকলে সেটি পড়ে নিন। আরও সামান্য পরিশ্রম করুন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর এঙ্গেলসের কিছু চিঠিপত্র রয়েছে। সেগুলোও পড়ুন। এইসব নিয়ে লিখতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়। গাল দিতে গেলেও পড়তে হয়।

হে লেখক, আপনি ভীষণ আপত্তিকর ও উদ্ভট সব কথা বলেছেন।

মার্ক্সের উদ্ধৃতির (২৫ পাতায়) পর ছড়াটড়া বলেছেন, এবং তা থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন চিন্তার মাহাত্ম্য। এরপর রবি ঠাকুরের লেখা তুলে মানবিক বোধ বিষয়ে কথা বলেছেন। মধ্যিখানে কান্টের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দিয়েছেন, বুঝেছেন কি? কান্ট যখন বলেন "বোধই প্রকৃতি তৈরী করে" তখন তা বলেন তাঁর নিজস্ব অজ্ঞেয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদ্দ্বারা প্রকৃতি বা জগৎ সম্পর্কে কিছু জানা অসম্ভব, যেহেতু আমাদের বোধ সাধারণ-অবস্থায় কখনোই বস্তুর সত্তারূপ (Thing-in-itself) স্পর্শ করতে পারে না এবং প্রকৃতির সেই রূপটিই আমরা দেখি যা আমাদের বোধ তৈরী করে। এর সাথে রবি ঠাকুরের নান্দনিক প্রকৃতি বোধের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আপনি বলেছেন, মানবিক বোধ একটি অচেতন বিশ্বাস। এর অর্থ? মানবিকতা কি একটি মীথ? যা আবহমানকাল ধরে মানুষের সামগ্রিক অবচেতনে সঞ্চারিত হচ্ছে? এবং তা সমাজ-পরিবেশ নিরপেক্ষ? আপনাকে ছোটোবেলা থেকে একপাল বাঁদরের সঙ্গে এক খাঁচায় ভরে রাখলে আপনার মানবিক বোধ জন্মাতো? খানিক ভেবে দেখবেন তো।

এরপর ভালোবাসা। ভালোবাসা মানে 'চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য'? 'বিশেষ পবিত্রতা'? 'হৃদয়ের প্রগাঢ় অনুভূতি'? আপনার বক্তব্য বিষয়টা কি? ভালোবাসা কি একটি অতি-লৌকিক ও পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় যা মানুষের মধ্যে সর্বদা, সমমাত্রায় বর্তমান থাকে? বরং তা কি একটি অবস্থাবদ্ধ ও সাময়িক একটি অনুভব নয়, যা সৃষ্ট হয় যে কোনো মানুষের নিউরোণগুচ্ছে তড়িৎ রাসায়নিক প্রবাহে? সাইবারনেটিকস্-এর যুগে ভালোবাসা-টাসা নিয়ে একটু সাবধানে কথা বলুন। বিশেষতঃ আপনি যখন PRAXIS, রাজনীতি, শিল্প এইসব নিয়ে তাত্ত্বিক নিবন্ধ লিখছেন, প্রেম-পত্রের আদর্শ রূপ ব্যাখ্যা করছেন না।

হে লেখক, আগাগোড়া লেখাটিতে আপনি এতো বাজে বকেছেন, সবটার উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবু কিছু কিছুর কথা বলি। ২৬ পাতায় একটি মার্ক্স-উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা থেকে মানবিক মৌলবোধের বিষয়গত উত্থানের কথা বোঝা যায়, কিন্তু "চিন্তার একটা সঠিক দৃষ্টি" (২৬ পাতাতেই) আপনি যার কথা লিখেছেন, তার সাথে তা সম্পর্কযুক্ত হয় না। মানুষ তো আদতে এবং প্রথমতঃ এক বস্তু, যার চিন্তাভাবনায় বস্তুজগতের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার একটি সাময়িক চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। বস্তুজগতের সাথে তার চিন্তার লড়াই

আছে নাকি ? এরপর আপনি গণিতশাস্ত্রের বিমূর্ততার কথা বলেছেন যাতে নাকি "অস্তিত্ব জীবনোপলব্ধির গাম্ভীর্য বিকশিত।" বাপ্‌রে! এর মানে কি? তারপরে বালজাক এবং গ্রীক ট্রাজেডি। "আবোল-তাবোলের" শেষ পাতায় সুকুমার রায়ের একটি লাইন আছে: "তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।" পড়েছেন ?

২২ পাতায় বেশ কবিতা-টবিতা দিয়েছেন। এ থেকে কী বোঝাতে চেয়েছেন ? লেনিনের চিন্তা-ভাবনা এতদ্বারা ভুল প্রমাণিত হয় ? কোনো কবি যদি পূর্ণিমার চাঁদ সম্পর্কে নানান কথা বলেই থাকেন, তাতে কী বোঝায় ? সংবেদন না জ্ঞানতত্ত্ব না চিত্রকল্পের উৎস ?

আপনার লেখা সম্পর্কে আর কিছু বলার নেই। এতো কথা বলার পরও লেখাটির প্রয়োজন কি তা বোঝা যায় না। লেখাটির বক্তব্য কি তাও বোঝা যায় না। তার একটা কারণ হোলো যা বলেছেন একদম ঠিকভাবে বলেন নি। বলতেও তো শিখতে হয়।

পরিশেষে একটি নীতিবাক্য। অম্বল হোলে লোকে জোলাপ-টোলাপ খায়। জ্ঞানের অম্বল হোলে কি খায় ? আর যাই খায়, কেউ যেন তাত্ত্বিক নিবন্ধ না লেখে।

বিনীত
সৌমিত্র ঘোষ
কলকাতা-৪৫

পুনশ্চ—বাংলা ভাষাটি একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ভাষা। যদিও তা লেখকের মাতৃভাষা, কিছু লিখবার-টিখবার আগে, বাজে বকবারও আগে, ভাষার ব্যবহারটা শিখে নেওয়া বোধহয় প্রাথমিক প্রয়োজন।

●

আমরা শক্তিশালী কবিতা গল্প প্রবন্ধ চাইছি।
যোগাযোগ: **অভিজিৎ ঘোষ** ১৬/এ রাজা লেন,
কলকাতা-৯ □

Anwartha February 1985 Rs. 2

বিপ্লবী প্রলেতারিয়ানদের স্বার্থে সমগ্র সমাজকে আমূল পরিবর্তিত করার বাসনা দূরের কথা, গণতন্ত্রী পেটিবুর্জোয়ারা সামাজিক পরিস্থিতিতে সেইটুকু পরিবর্তনের জন্যেই সচেষ্ট যাতে বর্তমান সমাজব্যবস্থা তাদের পক্ষে যথেষ্ট সহনীয় ও আরামপ্রদ হতে পারে। তাই তারা সর্বোপরি দাবি করে আমলাতন্ত্র ছাঁটাই করে এবং বৃহৎ ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের উপর প্রধান প্রধান করগুলির ভার চাপিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সংকোচ সাধন। .....

....আর শ্রমিকদের ব্যাপারে, তারা যে পূর্বের মতোই মজুরীখাটা শ্রমিক থাকবে, সর্বোপরি এ বিষয়ে তারা সুনিশ্চিত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গণতন্ত্রী পেটিবুর্জোয়ারা শ্রমিকদের জন্য কেবল চায় বেশী মজুরী ও আরো নিরাপদ জীবন। সংক্ষেপে এরা কমবেশী গোপন ভিক্ষা দিয়ে শ্রমিকদের বশীভূত করার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে তাদের অবস্থা সহনীয় করে তুলে তাদের বৈপ্লবিক শক্তিকে ভেঙ্গে দেবার আশা করে। ....যেখানে গণতন্ত্রী পেটিবুর্জোয়ারা চায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিপ্লবের পরিসমাপ্তি....সেখানে আমাদের স্বার্থ ও কর্তব্য হোলো বিপ্লবকে স্থায়ী করে তোলা। ....আমাদের পক্ষে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত মালিকানার অদলবদল নয়—ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপই, শ্রেণীবিরোধকে মোলায়েম করা নয়—শ্রেণীসমূহের বিলোপ, বর্তমান সমাজের উন্নতি সাধন নয়—নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা।

'কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি'-র একটি অংশ—লেখক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস।

অভিজিৎ ঘোষ ১৬/এ রাজা লেন কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশ করেছেন এবং হরিপদ পাত্র, সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমা প্রসাদ রায় লেন কলকাতা ৬ থেকে ছেপেছেন।